হজ পালন অবস্থায়
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নান্দনিক আচরণ

ফা য় সা ল বি ন আ লী আল বা’দানী

তরজমা ঃ মুহাম্মদ শামছুল হক সিদ্দিক

সম্পাদনা ঃ ফায়সাল বিন খালেদ

2011 - 1432

IslamHouse.com

ভূমিকা

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূলﷺ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা ধরো, এবং যা কিছু থেকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত হও।"[১] পবিত্র কোরআনের এ বাণীতে আল্লাহ্ পাক তাঁর রাসূলের আনুগত্য অবধারিত করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উত্তম আদর্শের অনুকরণের তাগিদ করে তিনি বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

" রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীতে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও পরকালে আশান্বিত ও আল্লাহকে স্মরণ করে প্রচুর" [২] শুধু তাই নয় বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্যকে তাঁর ভালোবাসা প্রাপ্তি ও পাপ মোচনের শর্তরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

" বলো, আল্লাহকে যদি তোমরা ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার আনুগত্য করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, ও তোমাদের পাপ মোচন করে দেবেন ।"[৩] রাসূলের আনুগত্য প্রকৃত অর্থে আল্লাহরই আনুগত্য, এ-বিষয়টি পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে অবাধ্য হলো আমি তোমাকে তার ওপর রক্ষী হিসেবে প্রেরণ করিনি"[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্যকারীকে প্রচুর ছোয়াবে ভূষিত করবেন বলেও আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে– নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ; যাদের প্রতি আল্লাহ অনুকম্পা করেছেন-তারা তাদের সঙ্গী হবে, আর সঙ্গী হিসেবে তারা কতই না উত্তম" [৫]

হজ ইসলামের একটি অন্যতম ইবাদত যেখানে রাসূলুল্লাহর আনুগত্য বিমূর্ত আকারে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। আলেমে দ্বীন ও জ্ঞান অন্বেষীদের অনেকেই হজ পালনে হাজিদের ভুলক্রটির বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন, কীভাবে হজ বিশুদ্ধ হয় অথবা বাতিল হয়ে যায় সেগুলোও গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে ক্রটি এড়াতে অনেকটা সফলতা এসেছে। বিকশিত হয়েছে এই মহান পুণ্য কৃত্য বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের কার্যক্রমও। তবে, হজ পালনকালে রাসূলুল্লাহর নান্দনিক আচরণ-অবস্থা –– যার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে আল্লাহর সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক চর্চায়, উম্মত ও স্বজনদের সাথে ওঠা-বসায়– এখনও ততটা যত্ন পায়নি। নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কারণে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে বলে আমি মনে করি।

-এ বিষয়টির অধ্যয়ন, অনুধাবন ও বাস্তবায়ন হজের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করে, দাসত্ব চর্চায় উৎকর্ষের স্পর্শ পাইয়ে দেয়।

- হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থা প্রচুর সংখ্যক মুসলমানের কাছেই অজানা। তাদের গুরুত্বের বিষয় কেবল হজে পালনীয় অনুষ্ঠানাদির হুকুম- আহকাম মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

- হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থা এমন কিছু অর্থ-বোধ-উদ্দেশকে ধারণ করে আছে যা , এমনকী, সুন্নত বিষয়ে গবেষণা ও আমলকারীদের কাছেও অজ্ঞাত ও প্রয়োগ থেকে বিলুপ্ত।

- হজের বিশেষ একটি মেজাজ ও ধরন রয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নানা পর্যায়ের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, তিনি এমন অনেকেরই দেখা পেয়েছেন, এত

নিবিড়ভাবে তাঁর সঙ্গ দেয়ার সুযোগ ইতিপূর্বে যাদের ভাগ্যে জোটেনি অথবা আদৌ তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ যাদের হয়নি। হজে, তাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থার এমন কিছু দিক শামিল রয়েছে যেগুলোর সাক্ষাৎ অন্য কোথাও মিলে না।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী-গণ সকলেই এবং স্বজনদের দুর্বল লোকেরা হজে রাসূলুল্লাহর সঙ্গী ছিলেন; যার ফলে তাদের সাথে আচার-আচরণের এমন কিছু দিক উজ্জ্বলতা পেয়েছে যা ইতিপূর্বে আর কোথাও পায় নি।

এটাই ছিল আমার মূল প্রেরণা। এখানে আমি চেষ্টা করেছি হজ পালনাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থা সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ চিত্র আঁকার। যাতে রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুকরণে আগ্রহী ও তাঁর আদর্শ অনুসরণে প্রাণিত ব্যক্তি সহজেই পথের সন্ধান পেয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ এর হজের বর্ণনা-সংবলিত পুস্তক যেহেতু প্রচুর তাই সে দিকে না গিয়ে কিছু নমুনা ও অন্যান্য দিক সংক্রান্ত কিছু ইঙ্গিত উল্লেখ করেই বিষয়টির উপসংহারে আসার প্রয়াস পেয়েছি। অন্যথায় এত ছোট পরিসরে এ-সুবিস্তৃত বিষয়টিকে সংকুচিত করে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন দিক একসাথে করে, সাবলীল ও সহজবোধ্য ধারাবাহিকতায় পেশ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনটি অনুচ্ছেদে বিষয়টি বিভক্ত করে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রথম অনুচ্ছেদ : হজে প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রাসূলুল্লাহর ﷺ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: উম্মতের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : হজে পরিবার পরিজনদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

এ-পুস্তকটি যেন হজ ও ওমরাকারীদের উপকারে আসে সে জন্য আল্লাহর কাছে রইল আমার প্রার্থনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য ও অনুসরণে আগ্রহী ব্যক্তিরাও যেন এ বইটি থেকে উপকৃত হতে পারেন সে জন্যও কামনা করছি আল্লাহর সাহায্য। মিনতি করছি আল্লাহ যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি অধিক শ্রবণকারী ও প্রার্থনা কবুলকারী ।

পরিশেষে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের যাদের সহযোগিতা না হলে বইটি বর্তমান আকৃতি পেতো না। তাদের সবার জন্য আমার পক্ষ থেকে রইল ঐকান্তিক দোয়া।

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সূচিপত্র

হজে প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিশালতা, আত্মীয়তার গভীরতা তাকওয়াধারীদের অমূল্য সম্পদ, ইবাদতকারীদের কাঙ্ক্ষিত মূলধন। আর হজ, এ তাকওয়া পরিচর্চার এক রূপময় কর্মশালা, দাসত্ব শেখার এক সমৃদ্ধ পাঠশালা– যেখানে দৃঢ়তা পায় আল্লাহর সাথে বান্দার সংশ্লিষ্টতা; উবুদিয়াতের নানা স্তরে বিচরণের অভিজ্ঞতায় যেখানে সিক্ত হয় মানুষের মন; আল্লাহর সামনে হীনতা দীনতা প্রকাশের নানা স্টেশনে ঘুরে ঘুরে উজ্জ্বলতা পায় হৃদয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ – যিনি তার প্রতিপালকের দাসত্ব চর্চায় ছিলেন সর্বোচ্চ শিখরে ,সম্পর্কের গভীরতায় , ও দৃঢ়তায় সর্বাগ্রে– বিচিত্র ভূমিকায় নিজেকে উন্মীলিত করলেন পবিত্র হজে। তিনি হাজিদেরকে শিখালেন, নেতৃত্ব দিলেন, স্ত্রীদের যত্ন নিলেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগের খেয়াল রাখলেন, পরিবার ভুক্তদের এহসান করলেন, ধৈর্য ধরলেন। তবে এ সবকিছুই করলেন স্রষ্টার সাথে তাঁর সম্পর্কের সর্বোচ্চ দাবি যথার্থভাবে পূরণ করেই এবং তার উষ্ণতা ও সার্বক্ষণিক বর্তমানতায় সামান্যতম বিঘ্ন না ঘটিয়েই।

যদি প্রতিপালকের সামনে রাসূলুল্লাহর হীনতা দীনতা প্রকাশের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের সবকটি ধারার বর্ণনা এখানে দিতে যাই, তাহলে লেখাটি দখল করবে বিস্তৃত পরিসর। তাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণগুলোর উল্লেখই উত্তম বলে মনে করে সেদিকেই নজর দিলাম।

এক. একত্ববাদের যত্ন ও চর্চা

তাওহীদ– প্রধান বিষয়সমূহের একটি যা রাসূলুল্লাহর জীবনে সবচেয়ে বেশি যত্ন পেয়েছে।

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

" তোমরা হজ ও ওমরাহ আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো।" [৬] আল্লাহর এ-নির্দেশ হজ পালনে ঐকান্তিকতার তাগিদ করছে। এ-নির্দেশের বাস্তবায়নেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওহীদকে তাঁর জীবনের মধ্যমণি বানিয়েছেন ও এর জন্যই সর্বস্ব উৎসর্গ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পবিত্র হজ পালনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কর্মধারা ও আমল একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে এ বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠে। নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে তাওহীদের প্রতি এ-গুরুত্বই প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ।

১.তালবিয়া: তালবিয়া, হজের স্লোগান [৭] ইবাদত-আরাধনা, জীবন-মরণ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশেই নিবেদিত– তালবিয়ার শব্দমালা এ কথারই ঘোষণা। হজরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :" তাওহীদ অবলম্বনে তিনি ﷺ তালবিয়া শুরু করলেন ও বললেন : আমি হাজির, হে আল্লাহ ! আমি হাজির। তোমার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার এবং রাজত্বও , তোমার কোনো শরিক নেই।"[৮] হজরত ইবনে ওমর বলেন : 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-শব্দমালায় আর কিছু বাড়াতেন না' [৯] হজরত আবু হুরায়রার (র) বর্ণনা মতে তালবিয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: لبيك إله الحق لبيك 'আমি হাজির সত্য ইলাহ আমি হাজির'। তালবিয়ার শব্দমালায় এক আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজিরা দেয়া, ও তার লা-শরিক হওয়ার ঘোষণা বার বার অনুরণিত হয় , আলোড়িত হয় একত্ববাদ অবিচল দৃঢ়তায়। তালবিয়া যেন সকল পৌত্তলিকতা, প্রতিমা-পূজা, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার সমীপে হীনতা দীনতা প্রকাশের বিরুদ্ধে এক অমোঘ ঘোষণা যা নবী-রাসূল পাঠানোর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। যে ঘোষণার সার্থক রূপায়ণ ঘটতে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিরক ও মুশরিকদের সকল

কর্মকাণ্ড থেকে দায়-মুক্তি ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা পড়ে শোনানোর মাধ্যমে।

২. ধর্মকর্ম পালনে ইখলাস-ঐকান্তিকতা যেন অর্জিত হয়, রিয়া ও লোক-দেখানো থেকে যেন দূরে থাকা যায় সে জন্য প্রতিপালকের কাছে আকুতি প্রকাশও তাওহীদ কেন্দ্রিকতার একটি আলামত। হজরত আনাস থেকে এক মারফু হাদিসে এসেছে : ‘ হে আল্লাহ ! এমন হজ চাই যা হবে লোক-দেখানো ও রিয়া থেকে মুক্ত।”[১০]

৩. তাওয়াফ শেষে যে দু’রাকাত নামাজ আদায় করতে হয় সেখানে ‘সূরা ইখলাস’ ও ‘সূরা আল-কাফিরুন’ পাঠের নিয়ম, [১১] তাওহীদের প্রতি গুরুত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। হজরত জাবের ﵁ বলেন : “ তিনি ﷺ এ-দু’রাকাতে তওহিদভিত্তিক সূরা ও ‘কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন ’ তিলাওয়াত করলেন।”[১২] অন্য এক বর্ণনায় তিনি ইখলাসের দুই সূরা‘ ‘কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন’ ও ‘কুল হুআল্লাহু আহাদ’ , তিলাওয়াত করেন।”[১৩]

৪. সাফা ও মারওয়ায় তাওহীদনির্ভর দোয়া একত্ববাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে নির্দেশ করে। হজরত জাবেরের (র) এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন:“ অতঃপর তিনি ﷺ সাফায় আরোহণ করলেন, কাবা দৃষ্টিগ্রাহ্য হলো, তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্বের কথা বললেন , তাঁর বড়োত্বের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ----
‘ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক , তাঁর কোনো শরিক নেই । রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।’ মারওয়াতে গিয়েও তিনি অনুরূপ করলেন।

৫. আরাফার দোয়া ও জিকিরসমূহেও তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে , ' উত্তম দোয়া আরাফা দিবসের দোয়া, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের সর্বোত্তম কথাটি হলো : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ' আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই , তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই । প্রশংসাও তাঁর । তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। [১৪]

আমর ইবনে শুয়াইবের বর্ণনা মতে : আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ যে দোয়াটি পড়েছেন তা ছিল : لا إله إلا الله---- ' আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই----' অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি بيده الخير 'তাঁরই হাতে কল্যাণ' অংশটি বাড়িয়ে দেন।

হজকারীদের - এমন কি ব্যাপকার্থে - মুসলমানদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে বিচিত্র ধরনের বেদআত, কুসংস্কার ও শিরকের ধূম্রজালে জড়িয়ে রয়েছে অনেকেই। এইজন্য ওলামা ও আল্লাহর পথে আহ্বায়কদের উচিত মানুষদেরকে ধর্মের মৌল বিষয়সমূহ ও তাওহীদের হাকীকত সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, শিরক ও বিপথগামিতা থেকে হুঁশিয়ার করা। তাওহীদ সম্পর্কে গুরুত্ব অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্বকেও ছাপিয়ে যাবে এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ । তিনি যখন হজরত মায়াযকে ইয়েমেনে পাঠালেন , বললেন : আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল , এ-সাক্ষীর প্রতি তাদেরকে আহ্বান করবে। তারা এক্ষেত্রে আনুগত্য প্রকাশ করলে জানিয়ে দেবে - আল্লাহ তাদের ওপর , রাত ও দিনে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এক্ষেত্রে আনুগত্য প্রকাশ করলে জানিয়ে দেবে - আল্লাহ তাদের সম্পদে সাদকাহ ফরজ করেছেন যা ধনীদের থেকে নেয়া হবে ও গরিবদেরকে দেয়া হবে।” [১৫]

হজে পালনীয় প্রতিটি কর্মেই তাওহীদের অমোঘ ভাব বহুধা ধারায় প্রবাহিত, ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক একনিষ্ঠভাবে চর্চিত। তাই হজ পালনকারী

প্রতিটি ব্যক্তিরই প্রয়োজন হৃদয়ের প্রতিটি ভাঁজে তাওহীদের ভাব প্রসারিত করে দেয়া। তাওহীদের ধারক ও বাহক বনে যাওয়া।

দুই. আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান

আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সম্মান-শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেসব বিষয়ের সম্মানের নির্দেশ দিয়েছেন যথার্থভাবে সেগুলোর সম্মান দাসত্বের শর্ত ও কল্যাণার্জনের পথ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে : ওটা.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

এবং যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্মান করবে তাঁদের হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই তা করবে।[১৬] আরো এরশাদ হয়েছে : " ইহাই , এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করে , প্রতিপালকের কাছে তা হয় উত্তম।"[১৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :" তোমরা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করো, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর দাসত্বকারী হবে।

অন্যদিকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি তাচ্ছিল্য-অনীহা-অবজ্ঞা-অবহেলা ও আল্লাহর হুরমত লঙ্ঘন থেকে কঠিনভাবে বারণ করেছেন। আল্লাহ পাক বাইতুল হারাম সম্পর্কে বলেন :

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.

'আর যে ব্যক্তি সেখানে– ইচ্ছাপূর্বক সীমা লঙ্ঘন করে – পাপ কাজ করতে যাবে, আমি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।' আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'এইসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা উহা লঙ্ঘন করো না। যারা এইসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম'।[১৮] তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

'আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর সীমা লঙ্ঘন করলে আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।' [১৯]

আল্লাহর এ-হুঁশিয়ারি চয়নকৃত বান্দাদের বোধগম্য হলো। নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানীরা বুঝে নিল। আর এঁদের লিস্টের শীর্ষে হলেন প্রেরিতদের ইমাম, সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ , আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সমধিক সম্মান শ্রদ্ধাকারী আল্লাহর সীমানাসমূহের সবচেয়ে বেশি যত্নবান ও সংরক্ষণকারী, ও তাঁর নিষিদ্ধ সীমানা থেকে দূরে অবস্থানকারী – মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হজে রাসূলুল্লাহ কর্তৃক আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সম্মান প্রদর্শন বিচিত্র ধারায় প্রকাশ পেয়েছে :

ক-

এহরামের জন্য গোসল করা ও চুল সুস্থির (তালবিদ) করা । গোসলের পর উত্তম

খুশবু ব্যবহার – হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত ﵁ বলেন: "তিনি দেখেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এহরামের জন্য বস্ত্র ছেড়েছেন ও গোসল করেছেন।"[২০] হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে :" আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চুল সুস্থিরকৃত (মুলাব্বাদ) অবস্থায় হজ শুরু করতে দেখেছি।"[২১] এক বর্ণনায় হজরত আয়েশা বলেন :" আমি এহরামের পূর্বে রাসূলুল্লাহর ﷺ গায়ে উত্তম খুশবু লাগাতাম।"[২২] অন্য এক বর্ণনায় " সর্বোত্তম খুশবু যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সংগ্রহ করতে পেতেন তা দিয়ে আমি তাঁকে সুগন্ধযুক্ত করতাম।" [২৩]

খ

কোরবানির জন্তু হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলাইফা থেকে উট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন যা আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে গণ্য। পবিত্র কোরআনে এসেছে

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ

" উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহর নিদর্শন।"[২৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কোরবানির কিছু জন্তুকে চিহ্নিত করলেন (ও প্রথা অনুসারে এগুলোর গলায় বা কুঁজে মালা ঝুলালেন । হজরত ইবনে আব্বাস (রা) এক বর্ণনায় বলেন: " রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলাইফায় যোহরের নামাজ আদায় করলেন, তিনি উষ্ট্রী নিয়ে আসতে বললেন ও তার কুঁজের ডানপার্শে ক্ষত করে চিহ্নিত করলেন, রক্ত বেয়ে পড়ল, অতঃপর তিনি দু'টি জুতো দিয়ে মালা ঝুলালেন" [২৫] ইমাম ইবনে কাছির বলেন: ' এর দ্বারা বুঝা গেলো কোরবানির এ-পশুটি তিনি নিজ হাতে চিহ্নিত ও তাকে মালা পরিয়েছেন । পক্ষান্তরে অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব অন্যরা পালন করেছে।"[২৬] অন্য একটি বর্ণাতেও এর সমর্থন মিলে যেখানে বলা হয়েছে: " তিনি তাঁর কোরবানির জন্তুটি ডানপার্শ দিয়ে চিহ্নিত করতে বললেন।"[২৭] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা যে, যে ব্যক্তি আরোহণের জন্তু পেলো সে যেন কোরবানির পশুতে আরোহণ না করে , এই মর্মে হজরত যাবেরের رضي الله عنه বর্ণনায় এসেছে : " অপারগ অবস্থায় সৌজন্যের সহিত এতে আরোহণ করো যতক্ষণ না অন্য একটি বাহন পাও"[২৮]

গ

হজে প্রবেশ থেকে শুরু করে ১০ জিলহজ জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ তালবিয়া পড়তে থাকা আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই উদাহরণ। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকেন " হজরত ইবনে মাসউদ এক বর্ণনায় বলেন : " যিনি সত্যসহ মোহাম্মদকে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমি মিনা থেকে আরাফায় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে গিয়েছি, তিনি কখনো তালবিয়া পড়া থেকে বিরত হননি জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত , হাঁ যদি মাঝখানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অথবা 'আল্লাহু আকবার' মিশ্রিত করতে চাইতেন তাহলে।" [২৯]

তালবিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর উঁচু করতেন যা সাহাবিগণ শুনতে পেতেন, হজরত ইবনে ওমর এক হাদিসে উল্লেখ করেন :" আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ চুল সুস্থিরকৃত অবস্থায় 'লাব্বাইক' বলতে শুনেছি।"[৩০] হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় : " রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : " জিব্রিল আমার কাছে এসেছেন, ঘোষিত আকারে তালবিয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন"।[৩১] হজরত আবু সাইদ رضي الله عنه তাঁর বর্ণনায় বলেন :" আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে গিয়েছি হজের তালবিয়া চিৎকার করে বলে বলে।"[৩২]

ঘ

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করেন সফরের অবসাদ ও আলুথালু ভাব ঝেড়ে ফেলার জন্য, আর মসজিদুল হারামে প্রবেশের সাথে সাথেই তিনি তাওয়াফ আরম্ভ করেন, এটাও আল্লাহর নির্ধারিত হজের পবিত্র অনুষ্ঠানাদি ও নিদর্শনের সম্মান-শ্রদ্ধার উদাহরণ। হজরত নাফে বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে ওমর মক্কায় এলে 'যু তা-ওয়া' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করতেন, সেখানেই তিনি প্রভাত করতেন এবং গোসল সেরে নিতেন। তিনি, অতঃপর , দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করতেন" ।[৩৩] হজরত আয়শা رضي الله عنها এর বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (মক্কায়) আগমন করলেন শুরুতেই ওজু করলেন ও তাওয়াফ সম্পাদন করলেন।"[৩৪]

ঙ

হজরে আসওয়াদ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যত্ন ও সম্মানবোধও আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে সম্মান দেখানোর একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাজরে আসওয়াদকে আঁকড়ে ধরেছেন, চুমু খেয়েছেন, এর ওপর সিজদা করেছেন ও এর পাশে কেঁদেছেন। তিনি রুকনে য়ামানী স্পর্শ করেছেন, হজরত ছাওয়ীদ ইবনে গাফালা বলেন : " আমি হজরত ওমরকে দেখেছি, তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমু খেয়েছেন , আঁকড়ে ধরেছেন ও বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহকে

দেখেছি তোমাকে সম্মান দেখাতে।"[৩৫] হজরত ইবনে আব্বাস ﵁ এক বর্ণনায় বলেন :" আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে ﵁ দেখেছি হাজরে আসওয়াদ এর ওপর ঝুঁকে পড়তে এবং বলতে : আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি একটি পাথর, তোমাকে চুমু খেতে ও স্পর্শ করতে আমি আমার প্রিয় নবীকে না দেখলে তোমাকে চুমু খেতাম না, স্পর্শও করতাম না।"[৩৬] অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন : " ওমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ কে দেখেছি. তিনি হজরে আসওয়াদ চুমু খেয়েছেন, এর ওপর সিজদা করেছেন এবং বলেছেন: রাসূলুল্লাহকে ﷺ এরূপ করতে দেখেছি তাই করেছি।"[৩৭] হজরত জাবের থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন : " তিনি হাজরে আসওয়াদ দিয়ে শুরু করলেন, তিনি তা চুমু খেলেন এবং কান্নায় দুই চোখ আপ্লুত করলেন।"[৩৮] হজরত ইবনে ওমর বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকনে য়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ প্রতি তাওয়াফেই স্পর্শ করতেন।"[৩৯]

চ

এ-পর্যায়ের আরেকটি উদাহরণ মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে নামাজ আদায়। সাফা পাহাড় থেকে সাঈ' শুরু ও এর ওপর, এবং মারওয়ার ওপর দোয়া ও জিকিরের উদ্দেশে দাঁড়ানো। হজরত জাবের ﵁ বলেন : " অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমে গেলেন এবং পড়লেন : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ' তোমারা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থল রূপে গ্রহণ করো' [৪০] তিনি মাকামে ইব্রাহীমকে তাঁর মাঝে ও কাবার মাঝে রাখলেন। তিনি দরজা দিয়ে সাফার দিকে বের হয়ে গেলেন । সাফার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন : إن الصفا والمروة من شعائر الله ' নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের একটি।'[৪১] আমি শুরু করছি যেটা দিয়ে শুরু করেছেন আল্লাহ। তিনি সাফা থেকে শুরু করলেন। সাফায় তিনি এতটুকু আরোহণ করলেন যে কাবা দৃষ্টিগ্রাহ্য হলো। তিনি কেবলামুখী হলেন , আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করলেন, তকবির পড়লেন এবং বললেন :

لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة ... ففعل على المروة كما فعل على الصفا

' আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসাও তাঁর । তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই , তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, ও একাই তাঁর শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন। এর মাঝে তিনি দোয়া করলেন, পূর্বের ন্যায় তিনবার বললেন, অতঃপর মারওয়া অভিমুখে রওনা হলেন... মারওয়াতেও তিনি অনুরূপ করলেন ।[৪২] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে " অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমে এলেন এবং পবিত্র কোরআনের এ-আয়াতটি পড়লেন:

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

" তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।"[৪৩] তিনি সেখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন এ-অবস্থায় যে মাকামে ইব্রাহীম তাঁর ও কাবার মাঝে..."[৪৪]

ছ

আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে তাজিম করা ও হজের পবিত্র অনুষ্ঠানাদির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানোর আরো একটি উদাহরণ মাশআরুল হারামে (মুযদালিফায় কুযাহ পাহাড়ের সন্নিকটে) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

" তোমাদের কোন ক্ষতি নেই যে তোমরা তোমাদের প্রভুর করুণা তালাশ করবে---[৪৫] এ-সময়ে তিনি আল্লাহর জিকিরে মত্ত থেকেছেন, আল্লাহর আশ্রয়ে

নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, তাঁর সামনে নিজেকে করেছেন অবনত। হজরত জাবের ﷺ বলেন : " তিনি আজান ও ইকামতসহ ফজরের নামাজ পড়লেন, প্রভাতরশ্মি বের হয়ে এলো, তিনি কাসওয়ায়– পরিবহণ হিসেবে ব্যবহৃত রাসূলুল্লাহর উট – আরোহণ করলেন , মাশআ'রুল হারামে এলেন, কেবলামুখী হলেন, আল্লাহকে ডাকলেন , তকবির ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়লেন, একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। দিনের আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করলেন।"[৪৬]

জ

১০ জিলহজ প্রাথমিক হালালের পর বায়তুল্লাহর জিয়ারতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা এ-পর্যায়েরই একটি উদাহরণ। হজরত আয়েশা (র) বলেন : ' আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সুগন্ধযুক্ত করেছি তাওয়াফে জিয়ারতের পূর্বে।'[৪৭]

ঝ

রাসূলুল্লাহ কর্তৃক হজকৃত্যের স্থান ও কালকে সম্মান করাও এই পর্যায়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম, তোমাদের এই মাস, এই শহর ও এই দিবসের হারামের মতই "। তিনি আরো বলেছেন : " নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত দিন য়াউমুননাহর, এর পর পরবর্তী দিন।"[৪৮] তিনি আরো বলেন: " আরাফা, য়াউমুন্নহর (১০ জিলহজ) ও তাশরীকের দিনসমূহ আমাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঈদ, এগুলো পান-ভোজের দিন।" [৪৯] তিনি যথাযথভাবে হজের সম্মান রক্ষা ও কোনো অর্থেই যাতে এর পবিত্রতা ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্য হাজিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন: " মাবরুর হজের একমাত্র প্রতিদান বেহেশ্ত।"[৫০] তিনি আরো বলেছেন : " যে হজ করল , এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রইল , অন্যায় কাজ করল না সে নবজাতক শিশুর মতো হয়ে গেলো।"[৫১] পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

“ হজ জ্ঞাত কয়েকটি মাস, যে এগুলোতে হজ ফরজ করে নিল তার উচিত হজে স্ত্রী সহবাস, অন্যায় ও ঝগড়া থেকে বিরত থাকা। আর তোমরা যে ভালো কাজ কর আল্লাহ তা জানেন। তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর, নিশ্চয়ই তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়। আমাকেﷺ তোমরা ভয় করো হে জ্ঞানীগণ।” [৫২]

এ তো গেলো হজে আল্লাহর শা'আয়ের-নিদর্শনসমূহের তাজিম ও হজকর্মের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় রাসূলুল্লাহ ﷺএর অবস্থা। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগের হজ পালনকারীদের কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে অনেকেই প্রকাশ্যভাবে সীমা লঙ্ঘন করছে , পবিত্র হজের অমর্যাদা করছে। এটা যথার্থভাবে আল্লাহকে মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদর্শনে ব্যর্থতারই আলামত। ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন :“ আল্লাহকে যথাযথভাবে মর্যাদা দেখাল না ওই ব্যক্তি, যার কাছে আল্লাহর নির্দেশ তুচ্ছ বলে মনে হলো ফলে তা অমান্য করল, তাঁর নিষেধ হালকা বলে মনে হলো অতঃপর সে তা করল। তার হক হীন বলে প্রতিভাত হলো অতঃপর সে তা নষ্ট করল। তাঁর জিকির নিরর্থক বলে মনে হলো অতঃপর সে তা উপেক্ষা করল ও তার হৃদয় এ-থেকে গাফেল রইল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের থেকে তার খায়েশই তার কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হলো, মখলুকের আনুগত্য তার কাছে স্রষ্টার আনুগত্যের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো । তার হৃদয়-জ্ঞান-কার্য-কথা ও সম্পদে আল্লাহর অধিকার যদি থাকে তাহলে কেবলই উচ্ছিষ্ট অংশে, এসব ক্ষেত্রে অন্যদের অধিকারই বরং অগ্রাধিকার পায়; কারণ তারাই তার গুরুত্বের পাত্র।’[৫৩] তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদাঙ্ক অনুসরণে আল্লাহর শা'আয়ের তথা নিদর্শনসমূহের সম্মান শ্রদ্ধা, তাঁর হুদুদ সমূহের তাজিম, হজ পালনে সর্বোচ্চ সতর্কতা, এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সত্য ন্যায় ও ধৈর্যের বিষয়ে উপদেশ দেয়া ব্যতীত অন্য কোনো গত্যন্তর নেই।

তিন. মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত হওয়ার ঘোষণা ও ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বিপরীত কাজ করা।

ইসলাম ও শিরক বিপরীতমুখী দুটি বিষয় যা কোনোদিন একত্রিত হতে পারে না। এ-দুয়ের একটির উপস্থিতির অর্থ অন্যটির বিদায়, ঠিক রাত-দিনের বৈপরিত্বের মতই। এজন্য মক্কায় পরিস্থিতি অনুকূলে এলে প্রথম যে কাজটি করেছেন তাহলো শিরকের নিদর্শনসমূহের অপনোদন, পৌত্তলিকতার চিহ্নসমূহ অপসারণ, এ-বিষয়টিকেই বরং রাসূলুল্লাহ দ্রুততার আমেজ দিয়েছেন। তিনি যখন মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন হাতে থাকা একটি লাঠি দিয়ে কাবার পাশে স্থাপিত মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন, এবং বলতে থাকেন:

وقل جاء الحق وزهق الباطل 'বলো সত্য এসেছে এবং অসত্য অপসারিত হয়েছে।' [৫৪] قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 'বলো, সত্য এসেছে আর অসত্য, সে তো কিছু সৃষ্টির অথবা পুনরাবৃত্তির ক্ষমতা রাখে না।' [৫৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবায় প্রবেশ থেকে বিরত থাকেন যতক্ষণ না সেখান থেকে মূর্তিগুলো অপসারিত হয়। হজরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন : " রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এলেন তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন যেহেতু সেখানে মূর্তি রয়েছে, অতঃপর এগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হলো এবং কাবা ঘর থেকে অপসারিত করা হলো।"[৫৬] পরবর্তীতে যখন আয়াত অবতীর্ণ হলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

" হে মোমিনগণ ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র, অতঃপর, এ-বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।"[৫৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে এ নির্দেশ বাস্তবায়নে তৎপর হলেন। তিনি হজরত আবু বকর (রা) কে নবম হিজরিতে মানুষের মাঝে এই বলে ঘোষণা দিতে বলেন " এ-বছরের পর কোনো মুশরিক যেন হজ না করে"।[৫৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হজের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মুশরিকদের উল্টো কাজ করতে যত্নবান ছিলেন ও বহু শা'আয়ের ও হজকর্মে আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ) এর আদর্শের অনুকরণ করেছেন । বিষয়টি গুরুত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

পৌঁছে যখন তিনি মুশরিকদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বললেন :‘ هدينا مخالف لهديهم ‘ আমাদের আদর্শ তাদেরটার থেকে ভিন্ন’। [৫৯] যখন তিনি আরাফার খুতবায় মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে (বারাআত) তথা দায়মুক্ত হওয়া এবং সম্পর্ক ছেদের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন , তিনি বললেন : “ জাহিলি যুগের সকল বিষয় আমার দু’পায়ের নীচে রাখা, জাহিলি যুগের সকল হত্যা বাতিল বলে ঘোষিত হলো, আর আমাদের হত্যাসমূহের প্রথম হত্যা বাতিল বলে ঘোষণা করছি ইবনে রবিয়া বিন হারেছের হত্যা। বনী সা’দে দুগ্ধপায়ী থাকা অবস্থায় হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। জাহিলি যুগের সুদ মওকুফ বলে ঘোষিত হলো, আর প্রথম সুদ মওকুফ করছি আমাদের সুদ , আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ, এর পুরোটাই মওকুফ।”[৬০]

এবিষয়টি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মীয় জাতীয়তাভিত্তিক ঐক্যের বিষয়ে তাগিদের মাধ্যমে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :“ তোমরা তোমাদের পবিত্র স্থানসমূহে থাকো কারণ তোমরা ইব্রাহীমের ঐতিহ্যের ওপর রয়েছ।”[৬১] মুসলমানদের একটা মর্যাদাপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে, হজকৃত্য আদায়ে তাদের রয়েছে একত্ববাদী পূর্বপুরুষদের এক বিশাল বাহিনী , রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ-বক্তব্য থেকেও উক্ত বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়। এই মর্মে রাসূলুল্লাহর একাধিক জায়গায় নবীগণ কর্তৃক হজ সম্পাদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন আল-আযরাক উপত্যকা হয়ে অতিক্রম করলেন , জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন উপত্যকা ? উত্তর করা হলো - আল আযরাক উপত্যকা। তিনি বললেন : মনে হয় যেন মুসাকে (আ) দেখছি সানিয়্যা থেকে নীচে অবতরণ করতে । তিনি তালবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে আওয়াজ উঁচু করছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হারশা সরু পথে গমন করলেন, তিনি বলবেন : এটা কোন সানিয়্যা ? উত্তর করা হলো সানিয়্যাতুল হারশা , তিনি বললেন , মনে হয় যেন ইউনুসকে (আ) দেখছি একটি মাংসল লাল উটের উপর সওয়ার অবস্থায়, তাঁর পরনে রয়েছে পশমির জুব্বা , উটের লাগাম আঁশের তৈরি, আর তিনি তালবিয়া পড়ছেন।”[৬২] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন :

" আমার আত্মা যে সত্তার হাতে তার কসম, অবশ্যই ইবনে মারয়াম (ঈসা আ) 'ফাজ্জুর রাওহা' জায়গা থেকে হজ্বকারী অথবা ওমরাকারী অথবা উভয়টা সম্পাদনকারী হিসেবে তালবিয়া পড়বেন।"[৬৩]

যেসব হজকর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবে মুশরিকদের বিপরীতে কাজ করেছেন তা অনেক , তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

তালবিয়া

মুশরিকরা তাদের তালবিয়ায় শিরক মিশ্রিত করতো এবং বলতো :

إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ' কিন্তু একজন অংশীদার যার তুমিই মালিক এবং তার যা কিছু রয়েছে তারও ' রাসূলুল্লাহ ﷺ তালবিয়ায় আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন শিরক দূরে সরিয়ে দিলেন, ও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন এবং ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করলেন।[৬৪]

উকুফে আরাফাহ

মুসলমানদেরকে নিয়ে তিনি আরাফার ময়দানে অবস্থান করলেন এবং
এ-ক্ষেত্রেও মুশরিকদের বিপরীত করলেন, কেননা মুশরিকরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং বলতো আমরা হারাম অঞ্চল ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে প্রস্থান করব না। [৬৫]

আরাফাহ ও মুযদালেফাহ থেকে প্রস্থান

সূর্যাস্তের পর আরাফাহ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রস্থান ও সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে প্রস্থান মুশরিকদের আচারের সাথে ভিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ছিল, কেননা মুশরিকরা সূর্যাস্তের আগেই আরাফা ত্যাগ করতো এবং মুযদালিফা ত্যাগ করতো সূর্যোদয়ের পর। হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ؓ বলেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফায় আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা করলেন, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং বললেন : মুশরিক ও পৌত্তলিকরা

এখান থেকে প্রস্থান করতো সূর্যাস্তের সময় যখন পাহাড়ের মাথায় পুরুষের পাগড়ির মতই অবস্থান করতো সূর্য । আমাদের আদর্শ ওদের থেকে ভিন্ন। তারা মাশআ'রুল হারাম থেকে পাহাড়ের মাথা বরাবর, ঠিক পুরুষের পাগড়ির ন্যায়, সূর্য উঠে যাওয়ার সময় প্রস্থান করতো, কেননা আমাদের আদর্শ তাদের থেকে ভিন্ন।"[৬৬] হজরত আমর ইবনে মায়মুন বলেন : " হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের ﵁ সাথে হজ করেছি, আমরা যখন মুযদলিফা থেকে প্রস্থান করতে চাইলাম তিনি বললেন : মুশরিকরা বলতো : ছাবির পর্বতের ওপর সূর্য উদিত হও যাতে দ্রুত গমন করতে পারি, আর তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করতো না, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উল্টো করেছেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রস্থান করেছেন।"[৬৭]

হজের পর হজরত আয়েশার (রা) ওমরা

মুশরিকদের থেকে আদর্শিক ভিন্নতা সৃষ্টির আরেকটি উদাহরণ হজ সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হজরত আয়েশাকে ওমরা করানো। মুশরিকরা মনে করতো সফর মাস প্রবেশের পূর্বে ওমরা শুদ্ধ হয় না। হজরত ইবনে আব্বাস ﵁ বর্ণনা করেন : " আল্লাহর কসম মুশরিকদের প্রথা বাতিল করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হজরত আয়েশাকে জিলহাজ্ব মাসে ওমরা করিয়েছেন। কোরাইশের এ গোত্রটি, ও তাদের অনুসারীরা বলতো : ' যখন উটের লোম গজিয়ে আধিক্য পাবে এবং পৃষ্ঠদেশ সুস্থ হবে এবং সফর মাস প্রবেশ করবে তখনই ওমরাকারীর ওমরা শুদ্ধ হবে'। তারা জিলহজ ও মোহররম অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ওমরা হারাম মনে করতো। "[৬৮]

শিরক সম্পাদিত স্থানসমূহে ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ

যেসব জায়গায় পূর্বে শিরক বা কুফর কর্ম অথবা আল্লাহর শত্রুতা প্রকাশ করা হয়েছে সেসব জায়গায় মুশরিকদের গাত্রদাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করা। এই মর্মে মীনায় বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদিস প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন : " আমরা আগামীকাল বনু কিনানার খায়ফে

যেতে যাচ্ছি, যেখানে তারা কুফরকর্মের ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে , আর তা ছিল এই যে কোরাইশ ও কিনানাহ বনু হাশীম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব - অথবা বনু মুত্তালিব- এর বিরুদ্ধে এই মর্মে কসম খেয়েছে যে তাদের সাথে তারা বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করবে না, বেচা কিনা করবে না , যতক্ষণ না নবীকে তাদের কাছে সোপর্দ করা হবে।"[৬৯] তবে আল্লাহ তাদের কোনো কাজই সিদ্ধি হতে দেন নি। বরং তাদের দমন করেছেন এবং ব্যর্থ মনরথ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার নবীকে সাহায্য করেছেন, তাঁর বাণীকে উঁচু করেছেন, তাঁর সরল-সোজা দ্বীনকে মজবুত করেছেন। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন :" এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাস যে তিনি তাওহীদের নিদর্শন কুফরের নিদর্শনের স্থানসমূহে প্রকাশ করতেন, এই সূত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ লাত উজ্জার জায়গায় তায়েফের মসজিদ নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৭০]

মুশরিকদের বিপরীতে চলা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিজ কর্মেই সীমাবদ্ধ থাকে নি তিনি বরং সাহাবাদেরকেও অনুরূপ করতে বলতেন যখন তাঁর নিজের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হতো না। যেমন এহরামের সময়, যে কুরাইশী নয়, তাকে নির্দেশ দিয়েছেন কুরাইশদের বিদআতের বিপরীত কাজ করার। যেমন তাদের নিয়ম ছিল– হজ পালন করতে আসা কোনো ব্যক্তি কোরাইশদের পোশাক ব্যতীত তাদের নিজস্ব পোশাকে তোয়াফ করতে পারবে না, যে ব্যক্তি এ-পোশাক পাবে না সে বিবস্ত্র হয়ে তোয়াফ করবে। [৭১] তাই এর বিপরীতে নবম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, হজ বিষয়ে মানুষের মধ্যে এই বলে ঘোষণা দিতে: " বিবস্ত্র হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর তোয়াফ করবে না।"[৭২] তদ্রুপভাবে সাহাবাদের মধ্যে যারা কোরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে আসেন নি তাঁদেরকে তামাত্তু করতে নির্দেশ দেয়া, যাতে তাদের হজ মুশরিকদের বিপরীত হয়। মুশরিকরা মনে করতো হজের মাসসমূহে ওমরা জঘন্যতম অপরাধ। [৭৩] একই সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদেরকে সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন :" সাঈ করো , কেননা আল্লাহ তোমাদের ওপর সাঈ লিখে দিয়েছেন।"[৭৪] আর এটা জাহেলী যুগে মুশরিকদের যে প্রথা ছিল তার উল্টো করার জন্য করেছেন; কেননা তারা মূর্তির উদ্দেশে হজ পালন করতো

এবং মনে করতো যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা বৈধ নয়। এ-বিষয়টি হজরত আয়েশা ওরওয়াহ ইবনে যুবাইরকে বুঝিয়ে বললেন যখন হজরত আয়েশাকে বললেন, " সাফা মারওয়ার মাঝে তোওয়াফ না করাটা আমার জন্য ক্ষতিকর মনে করি না , হজরত আয়েশা ﵂ জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? তিনি বললেন : কারণ আল্লাহ তা'লা বলেছেন :

إن الصفا والمروة من شعائر الله

"সাফা মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি।"[৭৫] হজরত আয়েশা বললেন আপনি যেরকম বলছেন বিষয়টি সেরকম হলে আয়াতটি এমন হতো : এ-দুয়ের মাঝে তোয়াফ না করলে কোনো ক্ষতি হবে না।' এ-আয়াতটি নাযিল হয়েছে আনসারদের কিছু লোকের ব্যাপারে যারা জাহিলি যুগে হজের নিয়ত করলে মানাতের উদ্দেশে করতো অতঃপর সাঈ করা তাদের জন্য অবৈধ হয়ে যেতো ।তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহর সাথে হজ করতে আসলেন বিষয়টি রাসূলুল্লাহর কাছে উপস্থাপন করলেন , এসময় আল্লাহ তা'লা এ আয়াতটি নাযিল করলেন। আমার জীবনের সাক্ষী আল্লাহ কখনোই কারো হজ পরিপূর্ণ করবেন না যদি না সে সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করে।"[৭৬]

এজন্যেই ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : ' মুশরিকদের বিপরীত-করার মনোবৃত্তির ওপর শরীয়ত স্থির হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে হজের আচার অনুষ্ঠানে'।[৭৭] তাই শত সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য যে এ-ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ-আদর্শ আপন করে নিল, এবং মুশরিকদের ধর্মের কোনো কিছুরই সামন্যতম স্পর্শে এলো না। বরং মুশরিকদের যা কিছু বৈশিষ্ট্য জীবনভর তার উল্টো চলার ব্যাপারে মনস্থির করে নিল, কেননা ' যে, কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্ব করল সে তাদেরই দলভুক্ত হলো।"[৭৮] , ' আর যে কোন জাতিকে ভালোবাসল তার হাশর তাদের সাথেই হলো।" [৭৯]

চার - আকুতি-মিনতির প্রাবল্য

নিঃসন্দেহে দোয়া একটি অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়। 'চূড়ান্ত পর্যায়ের হীনতা দীনতা, আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা ও বিনয় প্রকাশের মাধ্যম হলো এ-দোয়া'। [৮০] এজন্যে দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুকে সর্বোচ্চ ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেন নি মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন : " দোয়াই ইবাদত"[৮১] অর্থাৎ এবাদতের অধিকাংশ এবং এর সব চেয়ে বড় রুকন; কেননা আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া এবং অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার প্রতিই দোয়া ইঙ্গিত করে। [৮২] রাসূলুল্লাহ এক বাণীতে এও বলেছেন ' দোয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহর নিকট অন্য কিছু নেই।' [৮৩] হজে রাসূলের সাথে দোয়ার ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তিনি তাওয়াফের সময় তাঁর রবকে ডেকেছেন,[৮৪] সাফা মারওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে ডেকেছেন , আরাফায় উটের ওপর বসে হাত সিনা পর্যন্ত উঠিয়ে মিসকীন যেভাবে খাবার চায় সেভাবে দীর্ঘ দোয়া ও কান্নাকাটি করেছেন, আরাফার যে জায়গায় তিনি অবস্থান করেছেন সে জায়গায় স্থির হয়ে সূর্য ঢলে গেলে নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া করেছেন। মুযদালিফার মাশআরুল হারামে দীর্ঘ আকুতি মিনতি ও মুনাজাতে রত রয়েছেন সূর্যোদয়ের পূর্বে দিগন্ত উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত,[৮৫] তাশরীকের দিন সমূহে প্রথম দুই জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করেছেন,[৮৬] ইবনুল কাইয়েম বলেন , এ দোয়া ছিল সূরা বাকারার পরিমাণ। [৮৭]

এ-ছিল প্রার্থনার ক্ষেত্রে রাসূল থেকে বর্ণিত দোয়ার একাংশের বর্ণনা মাত্র। আর আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন ও জিকির থেকে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো বিরত হননি মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। এসময়ে তিনি আল্লাহর জিকিরে সদা সিক্ত যবান ছিলেন। আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী প্রশংসা তিনি অধিক পরিমাণে করেছেন যেমন– তালবিয়ায়, তাকবীরে , তাহলীলে, তাসবীহ ও আল্লাহর হামদ বর্ণনায়, দাঁড়িয়ে অথবা চলন্ত অবস্থায়, তথা সর্বক্ষেত্রে তিনি আল্লহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে গেছেন। হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন অবস্থা যে ব্যক্তি পরখ করে দেখবে এ ব্যাপারটি স্পষ্টরূপে তার কাছে প্রতিভাত হবে।

স্মরণ করিয়ে দেয়া ভালো যে, হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দোয়া মিনতি ও তাঁর প্রভুর প্রশংসাকীর্তনের যেটুকুর বর্ণনা মিলে তা অবর্ণিত অংশের তুলনায় অতি সামান্য। কেননা দোয়া তো হলো বান্দা ও তাঁর প্রভুর মাঝে এক অপ্রকাশিত রহস্য। প্রতিটি ব্যক্তি সংগোপনে তার প্রভুর সামনে নিবিড় আকুতি মোনাজাত পেশ করে যা কিছু তার প্রয়োজন সে বিষয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অংশটুকু প্রকাশ করেছেন তা কেবলই ছিল উম্মতের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার খাতিরে যাতে তারা তাঁর অনুসরণ করতে পারে। হজরত জাবের ﵁ এর হাদিস এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন : " এরপর রাসূলুল্লাহ (স) পড়লেন : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ' তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থলরূপে গ্রহণ করো ' আর তিনি আওয়াজ উঁচু করলেন লোকদেরকে শোনানোর জন্য।" [৮৮] যিকির তো হলো হজের উদ্দেশ্য ও বড়ো মকসুদ সমূহের একটি। নিম্নবর্ণিত আয়াতে একথারই ইঙ্গিত মিলে:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

" তোমরা তোমাদের হজ সম্পন্ন করলে আল্লাহকে স্মরণ করো যেমন তোমরা স্মরণ করো তোমাদের পিতাদেরকে।"[৮৯] আরো এরশাদ হয়েছে :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

" যাতে তারা তাদের পক্ষে কল্যাণকর বিষয়ের স্পর্শে আসতে পারে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।" [৯০] শুধু তাই নয় বরং হজের সকল আমল, আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশেই শরীয়তভুক্ত হয়েছে। হজরত আয়েশা ﷺ এর থেকে বর্ণিত মারফু হাদিস এদিকেই ইঙ্গিত করে, তিনি বলেন :" বায়তুল্লাহর

তোয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ এবং কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর যিকির আদায়ের লক্ষ্যেই রাখা হয়েছে।"[৯১]

উল্লেখ্য যে হজে রাসূলুল্লাহ যেসব দোয়া করেছেন তা ব্যাপক অর্থবোধক , যেমন য়ামানী দুই রুকনের মাঝখানে :

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি পৃথিবীতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং দোযখের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো।' [৯২]

এজন্য সে-ব্যক্তি সফল যে এ-ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করল ও বেশি বেশি মিনতি, কান্নাকাটি ও নীরবে প্রার্থনা করল; আল্লাহর সামনে নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করল; প্রয়োজন দেখাল; এবং যে তার মাওলার জন্য নত হলো ও নিজেকে হীন করে উপস্থিত করল; সচেতন হৃদয়সহ জিকিরের সম্পৃক্ততায় একচিত্ত হয়ে এঁটে রইল; ব্যাপক অর্থবোধক দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা করল।

পাঁচ - আল্লাহর খাতিরে ক্ষোভ প্রকাশ ও তাঁর নির্ধারিত সীমানায় দৃঢ়তার সাথে জমে থাকা তাকওয়ার শীর্ষ পর্যায়কে নির্দেশ করে। আর নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালকের ব্যাপারে সবার থেকে বেশি তাকওয়াধারী ছিলেন, তাঁর খাতিরে সবার থেকে বেশি রাগকারী, ও তাঁর সীমানা সম্পর্কে সবার থেকে বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হজের বিভিন্ন দৃশ্যে এবিষয়টির সাক্ষর মিলে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো –

নামাজ আদায় ও পরে এসে যারা হজ কাফেলায় মিলিত হতে চায় তাঁদের অপেক্ষায় পুরা একটি দিবস যুলহুলায়ফায় অবস্থান করা। আর এসবই আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নকে উদ্দেশ্য করে। হজরত ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন :

"আমি আকিক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি , আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক আগমনকারী এলেন এবং বললেন : আপনি এই

পবিত্র উপত্যকায় নামাজ আদায় করুন এবং বলুন 'হজের ভিতরে ওমরাহ প্রবিষ্ট' [৯৩], আর এটা এভাবে যে - নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে - রাসূলুল্লাহ মদীনা থেকে শনিবারে বের হয়েছেন চার রাকাত হিসেবে জোহরের নামাজ পড়ে, আর যুলহুলাইফা থেকে প্রস্থান করেছেন রবিবারে দু রাকাত হিসেবে জোহরের নামাজ পড়ে। ইমাম ইবনে কাছির বলেন :' দৃশ্যত: রাসূলুল্লাহকে আল-আকিক উপত্যকায় নামাজ পড়ার নির্দেশ দেয়ার অর্থ সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেয়া জোহরের নামাজ আদায় করা পর্যন্ত। কারণ নির্দেশটি রাসূলুল্লাহর কাছে রাতের বেলায় আসে যা তিনি তাদেরকে ফজরের নামাজের পর জানান, জোহরের নামাজের পূর্বে যেহেতু আর কোনো নামাজ নেই তাই এ-নামাজ পড়ার জন্যই তিনি নির্দেশিত হন। নিশ্চয়ই এ-অপেক্ষা রীতিমতো কষ্টকর ব্যাপার– বিশেষ করে সাথে যখন হাজার হাজার মুসাফির।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোরবানির পশু সঙ্গে এনেছেন বলে ইহরাম থেকে হালাল হননি, পক্ষান্তরে যারা কোরবানির পশু সঙ্গে আনে নি তাদেরকে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যেতে বললেন, এবং তাদের হজ্বকে ওমরায় রূপান্তরিত করতে বললেন । জনতা এই ভেবে বিলম্ব করলেন যে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবিষয়টি কেবল বৈধ হিসেবে অনুমতি দিয়েছেন, যা না করাটাই উত্তম হবে। আবার কেউ হালাল হতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে বললেন " আরাফায় এ অবস্থায় যাব যে তখনো আমাদের শিশ্ন বেয়ে রেত টপকাচ্ছে।" এ-সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাগান্বিত হলেন, আল্লাহর খাতিরে, কেননা তাঁর নির্দেশের যথাযথ সম্মান করা হয় নি অথচ তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। এ-অবস্থায় তিনি হজরত আয়েশার কাছে গেলে তিনি তাঁকে বললেন, যে আপনাকে রাগান্বিত করল তাকে আল্লাহ নরকগামী করুন। তিনি বললেন :' তুমি কি টের পাও নি? মানুষদেরকে একটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছি অথচ তা নিয়ে তারা ইতস্ততায় রয়েছে। আমি যদি আবার পেছনে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে কোরবানির পশু সঙ্গে আনতাম না, কিনে নিতাম আর হালাল হয়ে যেতাম, তাদের মতই। [৯৪] অতঃপর জনতা সাড়া দিল ও আনুগত্য প্রকাশ করল।

স্বীয় পত্নী হজরত সাফিইয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা একই পর্যায়ে পড়ে। হজ শেষে রওনা হবার দিন হজরত সাফিইয়া ঋতুবতী হন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন না যে তিনি তাওয়াফুল ইফাযা সেরে নিয়েছেন। তিনি বললেন :' এ-তো মনে হয় তোমাদের গতিরোধ করবে।'[৯৫] এ ছিল নিঃসন্দেহে এক বিব্রতকর অবস্থা। কেননা একজনের জন্য বাধাগ্রস্ত হতে হচ্ছে এতগুলো মানুষকে।

তাই আপনার উচিত শ্রেষ্ঠতম মানুষ রসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করা, প্রতিপালকের সীমানা লঙ্ঘিত হতে দেখলে রাগান্বিত হওয়া, এবং স্রষ্টার বেঁধে দেয়া গণ্ডির মধ্যেই অবস্থান করা, তাঁর আদেশ ও নিষেধের সীমানা সামান্যতম অতিক্রম না করা। কোথাও যেন এর উল্টো না হয় সেজন্য সতর্ক থাকা; কেননা তা ধ্বংস ও ফেতনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণ। " আমি যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে বারণ করলাম সেগুলো থেকে বিরত হও, আর যেগুলো করতে বললাম সাধ্যমতো সেগুলো করো। কেননা অধিক প্রশ্ন ও নবীদের বিষয়ে অনৈক্য ও মতবিরোধই তোমাদের পূর্ববতীদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।"[৯৬] পরিত্রাণ যদি পেতে চান তাহলে রাসূলের এ কথার প্রতিফলন ঘটান আপনার গোটা জীবনে। জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী যা বলেছেন তাও আঁকড়ে ধরুন মজবুত করে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ পাক যদি ' হে মুমিনগন' বলে সম্বোধন করেন তাহলে তা কান পেতে শুনুন; কারণ তিনি নিশ্চয়ই হয়তো কোন উত্তম কাজের নির্দেশ দেবেন অথবা কোন অকল্যাণকর বিষয় থেকে বারণ করবেন। যা তিনি বলবেন তা থেকে চুল পরিমাণও নড়বেন না; কেননা তা হবে নিশ্চিতরূপে দুর্ভাগ্যের কারণ ।

ছয়. বিনয়-নম্রতা ও শান্তভাব

চিত্তের সচেতনতা ও বিনয় ভাব প্রত্যঙ্গের শান্ত ও ভদ্র ভাব থেকে আঁচ করা যায়। কেননা যা দেখা যায় তা অভ্যন্তর বিষয়ের ঠিকানা বলে দেয়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় বিষয়কেই একত্রিত করেছেন তাঁর হজে। তিনি সচেতনতা বিষয়ে ছিলেন খুবই যত্নবান, কেননা এ-মৌসুমে হজ্বকর্ম ব্যতীত কোনো কিছুই তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। হজে তিনি প্রতিপালকের সামনে ছিলেন

সমধিক বিনম্র , বিনয়ী , ক্রন্দনকারী , অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জনকারী। প্রতিপালকের সামনে বেশি বেশি মিনতি, -মোনাজাত ও প্রার্থনাকারী হাত উঠিয়ে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থেকে। [৯৭] বেশ কিছু বর্ণনায় একথার সমর্থন মিলে :তোওয়াফে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হজরত জাবের ﵁ বলেন: হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তিনি শুরু করলেন, কান্নায় দু'নয়ন ভেসে গেলো। অতঃপর তিনি তিন চক্কর রমল করলেন, এবং চার চক্কর হেঁটে চলে শেষ করলেন, সমাপ্তির পর তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন, এর ওপর দুই হাত রাখলেন , ও তা দিয়ে চেহারা মাসেহ করলেন।"[৯৮]

হজরত সালেম হজরত ইবনে ওমর ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে সামনে এগিয়ে মন্থর-গতি হতেন , তিনি কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন ও বামে উপত্যকার পার্শ্বের দিকে মোড় নিতেন, হাত উঠিয়ে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা অবস্থায় তিনি দীর্ঘসময় দাঁড়াতেন। এরপর তিনি বাতনুলওয়াদী থেকে জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন, এখানে তিনি দাঁড়াতেন না। হজরত ইবনে ওমর ﵁ ও এরূপ করতেন এবং বলতেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরকমই করতে দেখেছি।"[৯৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও বিনম্র ভাব মূর্ত ছিল। তিনি শান্ত-ভদ্র ও কোমলভাবে হেঁটে চলতেন, ও হজ্বকৃত্যসমূহ ধীরস্থির ও শান্তভাবে আদায় করতেন। হজরত জাবের ﵁ এর কথা এদিকেই ইঙ্গিত করে, তিনি বলেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থায় প্রস্থান করতেন যে শান্তভাব তাঁর অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজ করতো।"[১০০] হজরত ফযল ইবনে আব্বাসের মন্তব্যও একই পর্যায়ের, তিনি বলেন :"তিনি যখন আরাফা থেকে প্রস্থান করলেন ধীরে সুস্থে চললেন এবং মুযদালেফায় এসে পৌঁছালেন।"[১০১] হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ এর বর্ণনাও একই সূত্রে গাঁথা, তিনি বলেন :"আরাফার দিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে চলতে শুরু করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিছনে উটকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ধমকা-ধমকি, প্রহার ও আওয়াজ শুনতে পেলেন, তিনি চাবুক দিয়ে ইশারা করে

তাদেরকে বলেন : "হে লোকসকল! শান্ত হও, কেননা দ্রুত চলায় কল্যাণ নেই।" [১০২]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পরিত্রাণ নিশ্চিতকারী আদর্শ আহরণ করুন, নিজের ওপর সাকিনাত-এর চাদর চড়িয়ে নিন, গাম্ভির্যের ভূষণে নিজেকে মুড়ে নিন, সান্তচিত্তে আপনার হজকৃত্য পালন করুন, যা করছেন ও বলছেন তার অর্থ ও ভাব স্পর্শ করুন, কেননা এরকমটি আপনাকে প্রজ্ঞার দীক্ষা দেবে, আপনার ও বাতুলতার মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। হজকৃত্যের মাধ্যমে আপনি নিজের আত্মাকে শান্তির স্পর্শ পাইয়ে দিন, আর মূর্খদের কর্ম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন যাদের হজ শেষ করে ফেলা ও এ-পূণ্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা নেই। তাদের চলন-বলনে যেন তারা বলে যাচ্ছে : প্রতিপালক আমাদের এ থেকে নিস্তার দিন, এটা বলছে না যে 'এর দ্বারা আমাদের প্রশান্ত করুন।'

৭- অধিক পরিমাণে ভালো কাজ করা

তাকওয়ায় নিজেদেরকে সজ্জিত করতে ও সৎকাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এরশাদ হয়েছে :" তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো, নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় - তাকওয়া, আর আমাকে ভয় করো হে জ্ঞানীরা।"[১০৩] আরো এরশাদ হয়েছে :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"ধাবমান হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় এবং যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।"[১০৪] হজে এরূপ অবস্থায় নিজেকে জড়িয়ে রাখাই ছিল রাসূলুল্লাহর আদর্শ ও অভ্যাস। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো থেকে এর ইঙ্গিত মিলে:

হজের মুস্তাহাব বিষয়গুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগ্রহ। যেমন এহরামের জন্য গোসল করা, [১০৫] হজে প্রবেশের পূর্বে ও হজ থেকে বের হয়ে সুগন্ধি মাখানো [১০৬], কোরবানির পশু চিহ্নিত করণ ও মালা পরানো [১০৭]

জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ ও এ-সময় আওয়াজ উঁচু করা। [১০৮] তোওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লায় পূণ্যকৃত্য শুরু,[১০৯] এবং সেখানে রমল করা [১১০], য়ামানী দুই কোণ স্পর্শ করা [১১১] মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে তোওয়াফের দুই রাকাত নামাজ আদায়, সাফা মারওয়ার পৃষ্ঠে দোয়া, এবং বাতনুলওয়াদীতে খুব দ্রুত চলা, [১১২] কাবা শরীফের দুই কোণ স্পর্শের ও কঙ্কর নিক্ষেপের সময় যিকির [১১৩], ও এ-জাতীয় বহু কাজ রাসূল ﷺ কর্তৃক সম্পাদন।

মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে দিগন্ত অত্যন্ত উদ্ভাসিত হওয়ার পর প্রস্থানও এর একটি উদাহরণ, যদিও এর পূর্বেই রাসূলুল্লাহর পক্ষে প্রস্থান করা বৈধ ছিল; কেননা তাঁর পরিবারের সদস্যদের দুর্বল লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। [১১৪]

একশত উট [১১৫] কোরবানি করাও এ পর্যায়ে পড়ে, কেননা এ সবের জায়গায় একটি উট অথবা গরুর একসপ্তমাংশ অথবা একটি মেষ-ই যথেষ্ট ছিল।[১১৬]

উল্লেখ্য হজকৃত্যের সকল কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই করেছেন যদিও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দিয়ে কর্ম সম্পাদন বৈধ রয়েছে। বিশেষ করে কোরবানির ক্ষেত্রে স্বয়ং পবিত্র হাতে তিনি তেষট্টিটি কোরবানী জবেহ করেন[১১৭], আর বাকিগুলো হজরত আলীকে প্রতিনিধি করে জবেহ করান। বর্ণনায় এসেছে - তিনি হজরত আলীকে কোরবানীতে শরীক করেন, এ-হিসেবে তিনি কাউকে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিও করেন নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেম অবলম্বন করেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সহায়তা নিয়েছেন একথা বলে এ-আদর্শের ব্যাপকতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে না, যেমন কোরবানির কিছু পশু চিহ্নিত করা[১১৮], ও নামিরায় তাবু খাটানো, মুযদালিফা থেকে কঙ্কর কুড়ানো [১১৯] তাঁর আরোহী জন্তু সেবা যত্ন ও বসার গদি ঠিক করানো [১২০] ইত্যাদি; কেননা এসব বিষয় হয়তো মূল হজকৃত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট নয় অথবা এগুলো সরাসরি হজকৃত্যের অংশ নয়।

মোটের ওপর কথা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হজ মনোযোগসহ ভেবে দেখলে মূর্ত হয়ে ধরা পড়বে যে, তিনি হজকৃত্য যথার্থভাবে পালনে প্রচণ্ডভাবে

আগ্রহী ছিলেন। সমানভাবে আগ্রহী ছিলেন সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন কর্ম সম্পাদন করতে, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো কল্যাণের দাবি ব্যতীত এ অবস্থান থেকে না সড়তে, যেমন আরোহণ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তোওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ করা [১২১] জনতার ভিড়ের সময় হাজরে আসওয়াদ লাঠি দিয়ে স্পর্শ করা [১২২] এটা এজন্য করেছেন যে জনতা যেন তাঁকে দেখতে পায় - প্রয়োজনে প্রশ্ন করা ও হজ্বকৃত্যর সঠিক কর্মধারা জেনে নেয়ার জন্য।

তাই হজ মৌসুমে ভালো কাজ করতে আপনিও স্থিরচিত্ত হন। যেসব বিষয় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সহায়ক সেগুলো বেশি বেশি করুন। আপনি সর্বোত্তম দিবসসমূহ অতিক্রম করছেন, এবং এমন এক মৌসুমে রয়েছেন যখন আল্লাহর তাকওয়া চর্চিত হয়, তাঁর নিমিত্তে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, যিকির ও মোনাজাত করা হয়, আর আল্লাহ তাঁর কাছে তো কেবল আপনার তাকওয়াটাই পৌঁছোয়, আপনার অর্থ-কড়ি ও চেহারা আকৃতির প্রতি তিনি দৃষ্টি দেন না, বরং দেখেন হৃদয় ও কর্ম। তাই কোমর বেঁধে লেগে যান, উচ্চাভিলাষী হন, শৈথিল্য ও আলস্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন, বয়স স্রোতের মতো চলে যাচ্ছে, অতীত ফিরে আসছে না কখনো । আর মনে রাখুন যে, আজকে কাজ আর কাজ, আর আগামীকাল কেবলই হিসেব দেয়ার সময়। তাই যে ব্যক্তি কাজ করল সে পরিত্রাণ পেলো, আর যে হেলায় কাটাল সে ধ্বংস হলো। হাদিসে এসেছে :“ কর্ম যাকে পিছিয়ে দিল, বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারল না।” [১২৩]

আট- ভারসাম্য ও মধ্যম পন্থা

কর্মে –মধ্যম পন্থাই উত্তম। এর বিপরীতে উভয় প্রান্তিকতাই অনুত্তম, অবাঞ্ছিত। শুভ্র শরীয়তে এরই তাগিদ এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো - তিনবার বললেন - কেননা যে ধর্ম বিষয়ে চাপাচাপি করে সে পরাভূত হয়”[১২৪] তিনি আরো বলেছেন,“ মধ্যম পন্থা ধরো মধ্যম পন্থা ধরো, তাহলে গন্তব্যে পৌঁছাবে।”[১২৫] হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থা ও চরিত্রগুণের যে-দিকটি সমধিক মূর্তিমান হলো তা এই ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা , এবং অবজ্ঞা

অথবা কঠোরতার প্রান্তিকতাকে ঘৃণা। প্রতিপালকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থার দুটি দিক, সম্ভবত, আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ক

প্রতিপালকের সাথে গভীর ও কঠিন সম্পর্কের মাধ্যমে নিজের যত্ন এবং একই সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে উম্মতকে শিক্ষা ও নেতৃত্ব দান, স্ত্রীদের যত্ন এবং পরিজনের প্রতি সদয় আচরণ।

খ

আত্মা ও শরীরের অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা , কেননা হজের ইমানআপ্লুত গুরুগম্ভীর পরিশেষে অনেককে যেখানে শরীরের অধিকার খর্ব করতে দেখি, আত্মার অধিকার প্রদানে প্রান্তিকতার শিকার হতে দেখি, সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখতে পাই শরীরের প্রতি পুরোপুরি যত্ন নিতে। এই সূত্রেই তিনি তারবীয়ার দিন (৮ জিল হজ) মিনায় উঠে যান আরাফার কাছাকাছি হওয়ার জন্য, এবং আরাফা ও মুযদালিফার রাতে ঘুমান [১২৬] এবং আরাফার দিন রোজা না রেখে কাটান। [১২৭] তিনি পশমের তৈরি গম্বুজের ছায়া গ্রহণ করেন যা পূর্বেই তাঁর জন্য দাঁড় করানো হয়েছিল। তিনি মুযদালিফার রাতে নফল ছেড়ে দেন, দুই নামাজের পূর্বে ও পরে, এবং সে রাত্রি ইবাদতের মাধ্যমে যাপন না করে সকাল পর্যন্ত ঘুমান। [১২৮] তিনি হজের পবিত্রস্থান সমূহের মাঝে গমনাগমন [১২৯] ও হজের কিছু আমল যেমন তোওয়াফ, সাঈ , জামরাতুল আকাবাহ সম্পাদন করার সময় পরিবহণের জন্তু ব্যবহার করেন।[১৩০] তিনি সেবা ও কাজকর্মের জন্য খাদেমও গ্রহণ করেন [১৩১] এ জাতীয় বিষয়াদি শরীরের যত্নের পর্যায়ে পড়ে এবং এ মৌসুমের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য শরীরকে সতেজ রাখে, আর এ মহৎ উদ্দেশ্য হলো দোয়া ও মোনাজাত এবং সচেতন-চিত্তে নিমগ্ন অবস্থায়, খুশু' ও ইতমিনানের সাথে হজ সম্পাদন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই ভারসাম্য উম্মুল হাসিনের (রা) হাদিসে আরো বিমূর্ত আকারে ধরা পড়ে। তিনি বলেন :" আমি বিদায় হজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

সাথে আদায় করেছি, জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর আমি তাঁকে উটের ওপর প্রস্থান করতে দেখেছি, তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল ও উছামাহ (রা)। এঁদের একজন সওয়ারি উট চালিয়ে নিচ্ছেন অন্যজন বস্ত্র উঁচু করে ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ছায়া দিচ্ছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সময় অনেক কথাই বললেন , এক সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : যদি তোমাদের ওপর নত নাশিকাবিশিষ্ট গোলামকেও নেতা বানানো হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করবে, তোমরা তার কথা মেনে চলো ও আনুগত্য করো ” [১৩২] বর্ণানাকারী সাহাবিয়াহ এ-হাদিসে বহু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেমন কঙ্কর নিক্ষেপ, বাহন ব্যবহার, ছায়া গ্রহণ, গাম্ভির্যতা নিয়ে চলা, কিছু সাহাবাগণ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেবা, গণমানুষকে শিক্ষা দান ও তাদেরকে ওয়াজ নসিহত কর, ইত্যাদি।

আপনি যদি গন্তব্যে পৌঁছোতে চান তাহলে আপনার দিক-নিদের্শক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন যিনি আপনাকে ও আপনার সতীর্থদেরকে বলেছেন, “নিশ্চয় ধর্ম সহজ, আর ধর্ম বিষয়ে যে ব্যক্তিই চাপাচাপি করে সেই পরাহত হয়, অতঃপর সোজা করো, নিকটে আনো, সুসংবাদ দাও , আর মাঝে মাঝে অবসাদ ঝেরে শক্তি সঞ্চয় করো, --- ”। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত বিষয়ে কখনো উদাসীন হবেন না, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয় [১৩৩], তাই কোমলতার সাথে আল্লাহর দিনে প্রবেশ করুন, আড়ম্বরতা ছেড়ে দিন, মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নিন, এবং আল্লাহর ইবাদত বিষয়ে আপনার অন্তরাত্মাকে বিষিয়ে তুলবেন না। “ কেননা মধ্যমপন্থীর সফর কখনো থামে না, আর আরোহণের কোনো পৃষ্ঠও সে বাদ রাখে না।” [১৩৪]

নয় - দুনিয়া বিমুখতা

আল্লাহর সন্তুষ্টির বলয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর হৃদয় ছিল বাঁধা, পরকালে যা কিছু উপকারী নয় তা থেকে তিনি ছিলেন বিমুখ। দুনিয়ার বিষয়ে ক্ষমতা থাকা

সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিরাগ্রহ। দুনিয়ার ধনরত্ন অবলীলায় তিনি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতেন, নিজের ও পরিজনের জন্য কিছুই সঞ্চিত করে রাখতেন না। রাসূলুল্লাহর গুণ বর্ণনাকারী জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, " তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়াত্যাগী ছিলেন।"[১৩৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতার ঘটনাসমূহ গুণে শেষ করা যাবে না। এর মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:

তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতেন : " হে আল্লাহ ! আপনি মুহাম্মদের পরিবারকে স্বাস্থ্য রক্ষার মতো রিযিক দিন।" [১৩৬] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : " হে আল্লাহর ! ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে এরূপ সম্পদ আপনি আলে মুহাম্মদের জন্য নির্ধারণ করুন"[১৩৭]

কখনো তিনি পুরা দিবস ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাটাতেন এবং উদরে দেয়ার জন্য নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না। হজরত ওমরের (রা) এক বর্ণনা মতে, আমি রাসূলুল্লাহকে সারা দিন ক্ষুধায় কাতর দেখেছি, তিনি পেটে দেয়ার জন্য অতি নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না। [১৩৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-অবস্থায় ইন্তেকাল করেন যে তিনি কখনো একাধারে তিনদিন গমের রুটি আহার করেন নি, হজরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ লাগাতার তিনদিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারেননি এ পর্যন্ত যে তিনি ইন্তেকাল করলেন"[১৩৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : "রাসূলুল্লাহ ﷺ তরল-ব্যঞ্জন দিয়ে গমের রুটি আহারে লাগাতার তিনদিন পরিতৃপ্ত হননি"[১৪০]।

আখেরাত বিষয়ে রাসূলুল্লাহর নির্লিপ্ততা এখান থেকে প্রকাশ পায় যে তিনি আরাফায় দাঁড়িয়ে বলেছেন: " আমি হাজির হে আল্লাহ আমি হাজির, আখেরাতের কল্যাণই তো কেবল কল্যাণ"[১৪১] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে," আমি হাজির, নিশ্চয়ই জীবন আখেরাতেরটাই।" [১৪২]

হজ মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুনিয়া ত্যাগের দৃষ্টিগ্রাহ্য ঘটনাসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ জীর্ণ পুরাতন গদি ও চার দিরহামের চাদরে হজ সম্পন্ন করেন যার মূল্য চার দিরহাম অথবা যার কোনো মূল্যই নেই।[১৪৩] ইবনুল কাইয়েম বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হজ গদি ওপর ছিল। মেহমাল , হাওদাজ বা আম্বারিয়ার ওপর ছিল না[১৪৪]। সহাবী ইবনে ওমর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ-অবস্থা স্মরণ করেন যখন বেশ কয়েক বছর পর য়ামানী হাজীদের একটি দল তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন, তাদের গদি ছিল শুকনো চামড়ার, উটের লাগাম ছিল পশমের বৃত্ত, (এসব দেখে) তিনি বললেন :" বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের অবস্থার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবছর আসা হাজিদের জামাত যে ব্যক্তি দেখতে চাইবে এই জামাতের দিকে যেন সে তাকিয়ে দেখে" [১৪৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আরোহণের জন্তু ছিল সদা ব্যবহৃত স্ত্রী-উট যা তিনি আসবাবপত্র ও পাথেয় বহনে ব্যবহার করতেন। হজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ কোনো উট তাঁর ছিল না । হজরত ছুমামা বলেন :" হজরত আনাস গদির ওপর হজ করেন, যদিও তিনি বখিল ছিলেন না, তিনি এও বর্ণনা করেছেন যে তিনি সওয়ারের পশুর ওপর সফর করেছেন আর তা ছিল সবসময় ব্যবহারের জন্তু।

হজরত উসামা ইবনে যায়েদ ও ফযল ইবনে আব্বাসকে সঙ্গে চড়িয়ে নেওয়াও[১৪৬] এ পর্যায়ে পড়ে ।

হজের সময় অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র না হওয়াও একই সূত্রে গাঁথা। এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ , রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পানের উৎসে এলেন এবং পান করতে পানি তলব করলেন , হজরত আব্বাস বললেন, হে ফযল ! তোমার মায়ের কাছে যাও এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য পানি নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ বললেন :" পানি দিন"। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, লোকেরা এতে হাত রাখছে, রাসূলুল্লাহ বললেন, পানি দিন ! অতঃপর তিনি সেখান থেকে পান করলেন[১৪৭] অন্য এক বর্ণনা মতে : ' বাড়ি থেকে আপনার জন্য পানি নিয়ে আসি, একথা বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন " ওতে আমার দরকার নেই , জনতা যেখান থেকে পান করছে সেখান থেকেই আমাকে দাও।"[১৪৮]

দুনিয়ার প্রতি অনীহার আরো একটি উদাহরণ বহুল পরিমাণে কোরবানি করা, কেননা তিনি একশত পশু কোরবানি করেছেন[১৪৯] পক্ষান্তরে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত ব্যক্তি- যা বাধ্যতামূলক- সেটুকু করেই ক্ষান্ত হয়।

হজের হাদি (উৎসর্গকৃত পশু) ও কোরবানি উভয়টাই একসাথে করা যদিও হাদি কোরবানিরও কাজ দেয়, এ-পর্যায়েরই একটি উদাহরণ।

অধিক পরিমাণে সদকা করা এবং লোকদেরকে খাওয়ানো এ পর্যায়েই পড়ে। কেননা তিনি তারবিয়ার দিন (৮ জিলহজ) নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়ানো অবস্থায় জবেহ করেছেন, আর ১০ যিলহজ্বের দিন হজরত আলীকে নির্দেশ করলেন গোশত, চামড়া ও গদি-লাগামসহ সমস্ত কিছু গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দিতে।[১৫০]

দুনিয়াত্যাগের আরেকটি উদাহরণ হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সদকা বণ্টন। কোরবানির দিন তিনি মেষের অতি সামান্য অংশকেও ভাগ করে দিয়েছেন[১৫১]। হজে রাসূলুল্লাহর কাছে দু'ব্যক্তি এলো, তিনি সদকা বণ্টনরত অবস্থায় ছিলেন, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে আবার দৃষ্টি নিম্নমুখী করলেন, তাদেরকে তিনি বলবান দেখতে পেলেন এবং বললেন :" তোমাদের ইচ্ছা হলে আমি দিতে পারি, তবে এতে ধনী ও উপার্জনক্ষম শক্তিমান ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই।"[১৫২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনাড়ম্বর ও অতি সাধারণ খাবারেও এ বিষয়টি স্পষ্ট । তিনি বিদায় হজের সময় কোরবানি জবেহ করলে হজরত ছাওবানকে বললেন : এই গোশতটা প্রস্তুত করো, ছাওবান বললেন : " আমি প্রস্তুত করলাম, এবং মদিনায় পৌঁছা পর্যন্ত তা থেকে তিনি আহার করে গেলেন" অন্য এক বর্ণনায় " আমি তাঁকে উহা থেকে আহার করাতে থাকি এ পর্যন্ত যে তিনি মদীনায় পৌঁছে যান।"[১৫৩]

তাই, যদি আপনার অন্তর্চক্ষুসর্বস্ব হৃদয় থেকে থাকে তাহলে দুনিয়া, ও এর চাকচিক্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। দুনিয়ার মোহমুগ্ধতা বা দাসত্ব থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। কেননা এ-হলো নশ্বর জগৎ, যা হীন ও নিকৃষ্ট। " যার বাড়ি নেই দুনিয়া কেবল তারই বাড়ি, যার সম্পদ নেই তার সম্পদ, আর

দুনিয়ার জন্য সেই জমায় যে অজ্ঞান, নির্বোধ।" দুনিয়া সন্তুষ্টির জায়গা হলে আল্লাহ তাঁর ওলী ও চয়নকৃত বান্দাদের জন্য তা পছন্দ করতেন, তাই দুনিয়াকে নিরাপদ মনে করে ভরসা করবেন না। আর এর ফিতনার বিষয়ে হুঁশিয়ার , কেননা ইহা কেবলই অহংকারের সামগ্রী।

এ-হলো প্রতিপালকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিবিড় সম্পর্ক, স্রষ্টার সামনে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ, মাওলার আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেয়ার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, বিমূর্ত দৃশ্যপট। হজের দিনগুলোতে এ সুযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। এ-হলো পুণ্য কেনার বিশাল বাজার, আনুগত্যের মৌসুম যা আপনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। একদিন স্রষ্টার আদালতে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, যখন নিজেকে দেখতে পাবেন আল্লাহর বিষয়ে অবহেলা করেছেন, তাঁর নির্দেশ অবজ্ঞা করেছেন, তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অলসতা দেখিয়েছেন, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করেছেন। কিন্তু সেসময় আক্ষেপ-আফসোস ব্যতীত আর কিছুই করার থাকবে না।

হজ্বে উম্মতের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থা

হজ্বে উম্মতের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থা

হজ্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নান্দনিক আচরণের প্রাবল্য সত্যিই আশ্চর্যের উদ্রেক করে। তিনি একই মুহূর্তে মানুষদেরকে শিখিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, যেখানে যা করার উচিত সর্বোত্তমরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন, এর অন্যথা ঘটেনি কখনো; ঘটে থাকলে ইতিহাসের ধূসর পাতায় হলেও তার কোনো ইঙ্গিত পেতাম।

উম্মতের সদস্যদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচার-অবস্থা ও কার্যরীতি তাঁর মহানুভবতা ও বড়োত্বের পরিচায়ক, তন্মধ্যে উজ্জ্বলতম হলো :

১-শিক্ষাদান

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহকে "শিক্ষক ও সহজকারী" হিসেবে পাঠিয়েছেন।[১৫৪] আর তিনি এ-দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। জনৈক বর্ণনাকারীর ভাষায় :" সর্বোত্তম শিক্ষাদাতা হিসেবে রাসূলুল্লাহর পূর্বে বা পরে কাউকে দেখিনি।"[১৫৫] যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺএর হজ্ব বিষয়ে চিন্তা করে দেখবে উল্লেখিত বর্ণনার মূর্ত প্রতীক হিসেবে তাঁকে পাবে; কেননা তিনি তাঁর সফর-সঙ্গী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য হজ্বের পূর্বেই মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে বললেন। মদীনার বাইরে 'যুলহুলাইফা' স্থানেও পুরা একদিন অবস্থান করলেন নবাগতদের অপেক্ষায়। [১৫৬] মদীনায় অনেকেই এলেন, অনেকে আবার পথে এসে যোগ দিলেন। সবার আগ্রহ একটাই, রাসূলুল্লাহর ﷺঅনুসরণ ও তাঁর কাছ থেকে শেখা। [১৫৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সাথে মিশে গেলেন, গোটা হজ্ব মৌসুমে সবার জন্য দৃশ্যমান হয়ে রইলেন।[১৫৮] কাউকে তাঁর সংস্রব থেকে বিমুখ করা হয়নি, অথবা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়নি। [১৫৯] রাস্তা দিন রাস্তা দিন -এজাতীয় কোনো কথাও শোনা যায়নি।[১৬০]

আদর্শ যথার্থরূপে পৌঁছে দেয়া, ও মানুষের ওপর আল্লাহর প্রমাণ কায়েম করার প্রতিই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমধিক মনোযোগ। তিনি মানুষজনকে

শিক্ষাগ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেন, তাদের শানিত করেন, তিনি যা বলেন ও করেন তার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন উপস্থাপনের পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, ও শেখানোর পদ্ধতিতে নতুনতা আনয়নের মাধ্যমে। এটাই হয়তো রাসূলুল্লহ ﷺ এর শেষ হজ্ব হতে পারে এই সম্ভাবনার কারণে তাঁর কাছ থেকে হজ্বকৃত্যের নিয়ম-কানুন রপ্ত করতে বললেন। [১৬১] মানুষদেরকে শান্ত ও চুপ করানোর জন্যও তিনি লোক নির্ধারিত করলেন,[১৬২] হযরত জারির رضي الله عنهথেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, লোকজনকে চুপ করাও, অতঃপর তিনি বললেন : আমার পর তোমরা কাফেরে রূপান্তরিত হয়ো না যে একে অন্যর গর্দানে আঘাত করবে। [১৬৩] হযরত বেলাল থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফার দিন সকালে তাঁকে বললেন : বেলাল! মানুষদের চুপ করাও। [১৬৪] তিনি প্রাপ্ত ওহী ও আদর্শ পোঁছিয়ে দিয়েছেন এব্যাপারেও সাক্ষী দেয়ার জন্যে মানুষদেরকে আহ্বান করেছেন; তিনি কোনো বিষয় শেখানোর কাজ সমাপ্তিতে বার বার জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: "আমি কি পোঁছিয়ে দিয়েছি"? [১৬৫] অতঃপর জনতা এই বলে সাক্ষ্য দিতো: "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি পোঁছিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্বপালন করেছেন, ও নসীহত করেছেন।" [১৬৬]

পোঁছিয়ে দেয়া ও শেখানোর দায়িত্ব রাসূলূল্লাহ ﷺ কেবল নিজেই পালন করেননি, বরং আরাফায় বক্তৃতা করার সময় রাবিয়া ইবনে উমাইয়াকে (রা) পিছনে দাঁড় করিয়েছেন চিৎকার করে তাঁর খুতবা মানুষদেরকে শোনানোর জন্য। [১৬৭] তিনি আরাফায় আরো একজন লোক নির্ধারণ করেন জনতার মাঝে ডেকে ডেকে তাঁর পক্ষ থেকে পয়গাম পোঁছিয়ে দেয়ার জন্য। মিনায় তিনি আলীকে (রা) দায়িত্ব দেন তাঁর কথা পুনর্বার ব্যক্ত করার জন্য, এ অবস্থায় যে মানুষেরা দাঁড়িয়ে ও বসে সেখানে অবস্থানরত ছিল।[১৬৮] তিনি একই উদ্দেশে আরাফা ও মিনায় হাজ্বীদের অবস্থানস্থলে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।[১৬৯] তিনি কোমলভাবে ও কৌতুকচ্ছলেও শেখান, ইবনে আব্বাস (র) বলেন :" আমরা বনু আব্দুল মুত্তালেবের বাচ্চারা উটের পিঠে করে মুযদালিফা থেকে রাসূলুল্লাহ কাছে উপস্থিত হই। তিনি আমাদের উরুতে হালকা আঘাত করতে লাগলেন

এবং বলতে লাগলেন : হে আমার বাচ্চারা ! সূর্যোদয়ের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করো না।" [১৭০]

তিনি কেবল সুস্থ ও বড়দেরকেই শেখাননি, অসুস্থদেরকেও শিখিয়েছেন ও দুর্বলদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এর একটি উদাহরণ যাবাআ' (রা) যখন রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন: য়্যা রাসুলুল্লাহ ! আমি হজ্ব করতে চাই কিন্তু আমি সমস্যার আশংকা করছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হজ্ব করো এবং শর্ত করে নাও , যেখানে আটকা পড়বে সেখানেই তোমার বিরতি হবে। [১৭১] উম্মে সালামা (রা) যখন শেকায়েত করলেন তাঁর সমস্যা হয়েছে তাকে বললেন :" আরোহণবস্থায় মানুষদের পার্শ্ব হয়ে (প্রান্ত অবলম্বন করে) তোওয়াফ করো।"[১৭২] রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা ও দুর্বলদের জন্য রাতের বেলাতেই মুযদালিফা থেকে প্রস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। [১৭৩]

তিনি শিশুদেরকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে শিখিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তখন ছোট ছিলেন, আকাবার দিন সকালে তিনি তাঁর উটের ওপর দাঁড়ানো ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "দাও, আমাকে কঙ্কর কুড়িয়ে দাও"। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্য আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করার উপযোগী কিছু কঙ্কর কুড়ালাম, রাসূলুল্লাহর হাতে রাখলাম, অতঃপর তিনি এরূপ কঙ্কর নিক্ষেপ করতে বললেন।[১৭৪] ছোটদেরকে শেখানোর ধারাবাহিকতায় তিনি বনু আব্দুল মুত্তালেবের শিশুদেরকে বলেছেন: " সূর্যোদয়ের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করো না।"[১৭৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান দেয়া ছিল না, তা ছিল মূলত বাস্তবে প্রয়োগের লক্ষ্যে। এজন্য কিছু হজ্বকর্মে শরিয়তভুক্তির হিকমতের বিষয়ে তিনি মানুষদেরকে সচেতন করেছেন, এই সূত্রেই তিনি বলেছেন: " তোওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং কঙ্কর নিক্ষেপের বিধান তো কেবল আল্লাহর যিকির কায়েমের উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে।" [১৭৬]
তিনি কিছু কর্মের মর্যাদা ও ফযিলতের কথা উল্লেখ করে মানুষের ইচ্ছাকে শানিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :" উত্তম দোয়া আরাফা দিবসের দোয়া, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বোত্তম যে কথাটি বলেছি তা

হলো, ‘ لاإله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই , তিনি একক, লা শরীক, রাজত্ব তারই, প্রশংসাও তাঁর, এবং তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।’ [১৭৭] তিনি আরো বলেছেন: হজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামানী স্পর্শ গুনাহকে সম্পূর্ণরূপে হ্রাস করে।”[১৭৮] আরো এরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তোওয়াফ করবে, দু’রাকাত নামাজ পড়বে সে গোলাম আযাদের সমপরিমাণ ছোয়াব পাবে।”[১৭৯] যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন হজ্ব উত্তম ? তিনি বললেন “উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া ও কোরবানির পশুর রক্ত প্রবাহিত করা।”[১৮০] জনৈক আনসারী মিনায় যখন হজ্বের কিছু আমলের ফযিলতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বললেন : “বাইতুল হারামের উদ্দেশে তোমার ঘর থেকে বের হওয়ার মানে তোমাকে বহনকারী উটের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ একটি করে পুণ্য লিখে দিবেন, এবং একটি পাপ মুছে দিবেন। আর আরাফায় তোমার অবস্থান, তখন তো আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন, অবস্থানকারীদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, এরা আমার দাস, এরা আলুথালু এবং ধুলায় আবৃত হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছে, এরা আমারই করুণা প্রত্যাশী, ও আমার শাস্তিকে ভয়কারী অথচ এরা আমাকে দেখে নি। যদি দেখতো তা হলে কেমন হতো? অতঃপর বিশাল মরুভূমির ধুলোর সংখ্যায়, অথবা পৃথিবীর সকল দিবসের সমান, অথবা আকাশের বৃষ্টির কণারাশির পরিমাণ পাপও যদি তোমার থেকে থাকে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন। আর কঙ্কর নিক্ষেপ, সেটা তোমার মূল্যবান সম্পদ হিসেবে রেখে দেয়া হবে। মাথা মুণ্ডন, এর ছোওয়াব তো এই যে প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে গুনাহ মাফ হবে। অতঃপর যখন বায়তুল্লাহর তোওয়াফ করবে, সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর মতো পাপমুক্ত হয়ে বের হয়ে আসবে”। [১৮১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বকর্মসমূহ পরিপূর্ণ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, যেসব আমল ইতিপূর্বে সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর কিছু ফলাফলও ব্যক্ত করেছেন, এর মধ্যে বেলাল (রা) এর হাদীস : “রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফার সকালে বলেছেন : “আল্লাহ তোমাদের ওপর করুণা করেছেন, পাপীদেরকে পুণ্যবানদের

হাওলা করেছেন, আর পুণ্যবানেরা যা চেয়েছে তাদেরকে তাই দেয়া হয়েছে। তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা হও।"[১৮২]

শেখানোর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়গুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো নিম্নরূপঃ

হজ্বের আহকাম : এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ তত্ত্বগত বর্ণনা ও প্রায়োগিক আমল এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করেছেন। এরই উদাহরণ, "তারবিয়া দিবসের (৮ জিলহজ্ব) একদিন পূর্বে তিনি জনতার মাঝে বক্তৃতা করেন, তাদের হজ্বে করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত করান,"[১৮৩] এর পর তিনি ﷺ হজ্বের প্রতিটি আমলের সময় তার পদ্ধতি বা
হুকুম বলে দেন।[১৮৪]

ইসলামের আরকান ও এর ভিত্তিসমূহের মর্যাদা ও অবস্থান বর্ণনা করা: এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের এক খুৎবায় বলেছেন," তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, রমজান মাসের রোজা রাখো, সম্পদের যাকাত দাও , নেতার আনুগত্য করো, তবে প্রতিপালকের বেহেশতে স্থান পাবে।"[১৮৫]

শিরক ও বড়ো পাপ যেমন, রক্ত-সম্পদ-ইজ্জতসম্মান ইত্যাদিতে আঘাত - যেগুলোর ব্যাপার সকল শরীয়তই অভিন্ন মত মত পোষণ করেছে - এসব থেকে বারণও এ পর্যায়ে পড়ে, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, তোমাদের রক্ত সম্পদ ও ইজ্জত তোমাদের মাঝে হারাম। তোমাদের এই দিবস এই মাস ও এই স্থলের মতোই, তিনি বললেনঃ চারটি বিষয়ে (সতর্ক হও) আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করো না, যে আত্মাকে আল্লাহ হারাম করেছেন তা হত্যা করো না, তবে সত্যসহ । চুরি করো না। ব্যভিচার করো না।"[১৮৬]

কিছু শরীয়তী হুকুম আহকাম বর্ণনা : যেমন মুহরেমের গোসল, ও তার কাফন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেনঃ "এক ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানরত থাকা কালে তার আরোহণের জন্তু থেকে পড়ে যায়, অতঃপর জন্তুটি তাকে পদ পিষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে গোসল করাও, দুই কাপড়ে তাকে কাফন পরাও,

সুগন্ধি দিয়ে আবৃত করো না, তার মাথাও ঢেকো না, কেননা কেয়ামত দিবসে সে তালবিয়া পড়া অবস্থায় উঠবে।” [১৮৭]

অথচ সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে উম্মতের বড়ো ব্যাধি হলো মূর্খতা-জ্ঞানহীনতা। উম্মতের অধিকাংশের মেধা-মস্তিষ্ক জুড়ে শক্তভাবে শেকড় গেড়ে নিয়েছে এ-জ্ঞানহীনতা। ধর্মের এমন সব বিষয় মানুষের কাছে অজ্ঞাত হয়ে গেছে যা ভাবতেও অবাক লাগে, আর এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে স্মৃতিনাশ ঘটেছে যা রীতিমতো কল্পনার বাইরে। এমনকী ইসলামের প্রতীকী চিহ্নগুলোও অনেকের মানস-পট থেকে হারিয়ে গেছে। ইসলামের রীতিনীতি ও কায়দা-কানুন আজ অজানা, মুসলমানদের বিরাট অংশের ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততা কেবলই উত্তরাধিকারসূত্রে, ইতিহাস ও আবেগতাড়িত, জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং এর দাবি অনুসারে প্রয়োগ ও আমলভিত্তিক নয়। এ-শূন্যতাই প্রবৃত্তিপূজারি, পথভ্রষ্টকারী সম্প্রদায়কে সুযোগ করে দিয়েছে তাদের সত্য-বিচ্যুত ধ্যনধারণাসমূহ রূপালি মোড়কে আবৃত করে সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে দিতে। এমনভাবে যে অন্ধকার আলো বলে মনে হতে লাগে, মুনকার মা’রুফ বলে ভ্রম হয়। আর এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞানের দৈন্যতা ও উচ্ছ্বসিত আবেগকে তারা ব্যবহার করে। আর এভাবেই বাতিলের ব্যাপ্তি বেড়ে যায়। সত্য মিশ্রিত হয়ে পড়ে অসংখ্য বাতিলের ভিড়ে।

আজ যেহেতু লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতিবছর হজ্ব মৌসুমে পবিত্র ভূমিতে একত্রে পাওয়া যাচ্ছে, এটা অবশ্যই এক সুবর্ণসুযোগ যেখানে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানীগণ মানুষদেরকে দ্বীন শিখাতে, এর হুকুম আহকাম বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করতে, ইসলামের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা, গর্ববোধ বাড়াতে ও গভীর করতে পাড়বেন। ইসলামী আদর্শ বাস্তবে রূপ দিতে, মানুষদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে , এর অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে আরো শানিত করতে সমর্থ হবেন। এ বিষয়গুলো হজ্ব পলনরত যেকোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে-যার সত্য প্রচার ও বর্ণনায় দক্ষতা রয়েছে- এ দায়িত্ব দেয় যে হজ্বকারীদের ধর্মীয় জ্ঞানের দৈন্যতা দূর করতে সর্বশেষ চেষ্টাটুকু ব্যয় করবেন যাতে

উম্মতের ওপর থেকে অজ্ঞতার কালো মেঘ অপসারিত হয়, অন্ধকারে আলো জ্বলে।

২- ইফতা বা ফতোয়া প্রদান

হজ্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সমূহের একটি হলো হজ্বসংক্রান্ত কোনো অনুশাসনের ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিলে তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া, ও এতৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া। হজ্ব মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এজাতীয় ফতোয়া অনেক। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত প্রসিদ্ধ কয়টি হলো নিরূপ:

খাসআমের এক মহিলা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, হজ্ব তার ওপর ফরজ। তিনি উটের ওপর সোজা হয়ে বসতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে দাও। [১৮৮] য়াউমুন্নাহর বা জিলহজ্বের দশ তারিখের কার্যাবলির ধারাবাহিক অনুক্রমে যারা হেরফের করেছেন তাদেরকে তিনি বলেছেন, " করো, সমস্যা নেই।"[১৮৯]

হজ্বমৌসুমে রাসূল্লাহ ﷺ এর ফতোওয়া প্রদান প্রক্রিয়ায় কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

- সর্বসাধারণের স্বার্থে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তারা যাতে সহজেই তাঁকে দেখতে পায় ও প্রশ্ন করতে পারে সেজন্য দৃশ্যমান হয়ে থাকা। নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ এ ইঙ্গিতই বহন করছে:

হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন :" বিদায় হজ্বের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের উপর আরোহিত অবস্থায় তোওয়াফ করেন। লাঠি দিয়ে তিনি হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন, উদ্দেশ্য যাতে জনতা তাঁকে দেখতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে এবং তিনি তত্ত্বাবধান করতে পারেন, কেননা জনতা তাঁকে ঢেকে ফেলেছিল[১৯০]।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় জনতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন যাতে তারা প্রশ্ন করতে পারে...।"[১৯১] অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন :" অতঃপর রাসূলুল্লাহ মানুষের উদ্দেশে দাঁড়ালেন তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে।"[১৯২]

তিনি প্রয়োজনগ্রস্তদের প্রতি লক্ষ্য করে ফতোয়ায় সহজকরণের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন, এর বহু উদাহরণ রয়েছে:

আয়েশা (রা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবায়া বিনতে যুবাইর ইবনে আব্দুল্লাহর (রা) বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তিনি বললেন :" হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্ব করতে চাই, কিন্তু আমি আশংকাগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হজ্ব করো, এবং শর্ত লাগাও, যেখানে আটকা পড়বে সেখানেই তোমার বিরতি হবে।"[১৯৩]

জাবেরের (রা) দীর্ঘ হাদীসের একাংশে এসেছে রাসূলুল্লাহ বলেছেন: "যদি আমি পিছনের দিনগুলোকে আবার সামনে পেতাম হাদির পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না, আর এই (তীর্থযাত্রাকে) রূপান্তরিত করতাম ওমরায়। তাই যার সাথে হাদির পশু নেই সে যেন হালাল হয়ে যায়, এবং এটাকে ওমরা বানিয়ে ফেলে। সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জাশআম বললেন, এটা কি কেবল এবছরের জন্য, য়্যা রাসূলুল্লাহ, না অনন্তকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুবারক আঙ্গুলসমূহ পরস্পরে প্রবিষ্ট করালেন, এবং বললেন: ওমরা, হজ্বে প্রবিষ্ট হয়েছে; ওমরা, হজ্বে প্রবিষ্ট হয়েছে, না - বরং অনন্ত অনন্ত কালের জন্য। [১৯৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত :" তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ১০ যিলহজ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞাসা করল : আমি ভেবেছিলাম অমুক বিষয়টি অমুকটার পূর্বে; আর এক ব্যক্তি উঠে বলল, আমি ভেবেছিলাম অমুক জিনিসটি অমুকটার পূর্বে, আমি কোরবানির পূর্বেই মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি; আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কোরবানি করে ফেলেছি, এ-ধরনের আরো বিষয় উত্থাপিত হলো। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :" করো, কোনো সমস্যা নেই - সবার জন্যই এ কথা বললেন- আর সেদিন রাসূলুল্লাহ যে ব্যাপারেই জিজ্ঞাসিত হলেন বললেন, করে , সমস্যা নেই।" [১৯৫]

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :" আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেব হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন।"[১৯৬]

আদী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের রাখালদের জন্য মিনায় রাত্রি যাপন না করার অনুমতি দেন, তারা য়াওমুননাহারে (১০

জিলহজ্ব) কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং পরের দু'দিনের যেকোনো এক দিন একসাথে নিক্ষেপের অনুমতি দেন।" [১৯৭]

-ফতোয়ায় তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন : যেমন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতা খুব বৃদ্ধাবস্থায় ইসলাম পেয়েছেন, উটের পিঠে তিনি স্থির হয়ে বসতে পারেন না, আমি কি তবে তার হয়ে হজ্ব করে দেবো ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: দেখ, যদি তিনি ঋণগ্রস্ত হতেন এবং তার পক্ষ থেকে তুমি আদায় করে দিতে, তাহলে কি হতো? লোকটি বলল: হাঁ, হতো। তিনি বললেন:' তাহলে তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব করে নাও।'[১৯৮]

প্রশ্নকারীদের বিষয়ে তিনি ধৈর্যশীল, সহনশীল, বিনম্র ও দয়া পরবশ ছিলেন। এর দৃষ্টান্ত বহু, যেমন:
হযরত জাবেরের (রা) দীর্ঘ হাদীসের একাংশে রয়েছে :" এরপর তিনি কাসওয়ায়[১৯৯] আরোহণ করলেন, উট তাঁকে নিয়ে মরুপ্রান্তরে যখন চলতে লাগল আমি তাঁর সামনে- পিছনে ডানে-বামে, যতদূর দৃষ্টি গেলো- আরোহী অথবা পদব্রাজী মানুষের ভির দেখতে পেলাম।"[২০০]

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখে মানুষের ঢল নামল, তারা বলল: এইতো মুহাম্মদ। এইতো মুহাম্মদ! এমনকী মহিলারাও বাড়ির বাইরে চলে এলো। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছ থেকে কাউকে তাড়িয়ে দিতেন না। মানুষের ভির বেড়ে গেলে তিনি আরোহণ করলেন, তবে হেঁটে যাওয়া ও শ্রম-ক্লিষ্ট হওয়া উত্তম।" [২০১] অন্য এক স্থানে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন:" তিনি উটে চড়ে সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন, তবে এটা সুন্নত নয়। মানুষদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হতো না, তাদেরকে দূরে ঠেলাও হতো না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে চড়ে সাঈ করেছেন, যাতে মানুষেরা তাঁকে শুনতে পারে, দেখতে পারে এ-অবস্থায় যে তিনি থাকবেন তাদের হাতের স্পর্শের বাইরে।"[২০২]

কুদামাহ ইবনে আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : " আমি ১০ যিলহজ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি লাল বর্ণের উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখলাম, মারধর, বিতরণ বা রাস্তা দিন রাস্তা দিন, এজাতীয় কিছুই সেখানে ছিল না।" [২০৩]

হজ্বমৌসুমে তিনি হজ্ব বিষয়েই অধিকাংশ ফতোয়া দিয়েছেন, যেমন: আসমা বিনতে উমাইস (রা) যুলহুলাইফায় সন্তান প্রসব করলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন এখন তিনি কী করবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: গোসল করো, স্রাব শোষণের জন্য একটি কাপড় ব্যবহার করো, ও এহরাম বাঁধো।"[২০৪]

তিনি ﷺ যখন সাহাবাদেরকে হালাল হতে বললেন, জিজ্ঞাসিত হলেন, কীরকম হালাল হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, পুরোপুরি হালাল।"[২০৫]
আওস আত্তাঈ (রা) প্রশ্ন করে যখন বললেন:" আমি তাঈ পাহাড় থেকে এসেছি, আরোহণের উটকে আমি ক্লিষ্ট করেছি, নিজেকে করেছি পরিশ্রান্ত, এমন কোনো বালির স্তূপ নেই যেখানে আমি থামিনি। আমি কি তাহলে হজ্ব করেছি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যে ব্যক্তি আমাদের এ নামাজে হাজির হলো, আমরা এখান থেকে প্রস্থান করবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকল, এবং এর পূর্বে, রাতে বা দিনে, আরাফায় অবস্থান করল, সে হজ্ব পরিপূর্ণ করল --।"[২০৬]

হজ্বমৌসুমে- সংখ্যায় কম হলেও- তিনি অন্য প্রসঙ্গেও ফতোয়া দিয়েছেন, এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:
জাবের (রা) বলেন :" আমাদের দ্বীন বিষয়ে বর্ণনা দিন, যেন এইমাত্র আমাদের জন্ম হয়েছে, আমরা এ পৃথিবীতে যে আমল করছি তার উৎস কী, অকাট্যবিধি যার লিখিত কালি শুকিয়ে গেছে, অথবা তাই করছি যা সামনে আসছে । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: " না, বরং তাই করছি যার লিখিত কালি বিশুষ্ক হয়েছে এবং প্রবাহ পেয়েছে ভাগ্য। প্রশ্নকারী বললেন, তাহলে আমরা কেন আমল করছি? তিনি বললেন: কাজ করে যাও, প্রত্যেকের জন্য তার নিজস্ব পথ সহজ করে দেয়া হয়েছে।"[২০৭]

আবু কাতাদার এক বর্ণনায় এসেছে :" রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলেন, আমারা তাঁর সঙ্গে বের হলাম।-- এ-হাদীসে আবু কাতাদার গাধী শিকার ও তার সঙ্গীদের এর গোশত আহারের কথা আছে যারা ছিল না এহ্রাম অবস্থায়। তিনি বলেন : তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল-আমরা তো এহ্রাম অবস্থায় শিকারকৃত জন্তুর গোশত খেয়ে ফেললাম। অতঃপর তারা অবশিষ্ট গোশত বহন করে রাসূলুল্লহ ﷺ দরবারে এলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এহ্রাম বেঁধেছিলাম, আবু কাতাদা ইহ্রাম বাঁধেনি, আমরা জঙ্গলী গাধার পাল দেখলাম, আবুকাতাদাহ্ ধাওয়া করল এবং একটি গাধী শিকার করল, আমরা গেলাম ও তার গোশত আহার করলাম। আমরা পরস্পরে বললাম, শিকারকৃত জন্তুর গোশত ইহরাম অবস্থায় কীভাবে খাবো ? তাই অবশিষ্ট গোশত বহন করে নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি কেউ আবু কাতাদাহকে এ-কাজ করতে বলেছ অথবা এ-ব্যাপারে কোনো ইশারা দিয়েছ ? তারা বললেন, না, করিনি। তিনি বললে, তাহলে অবশিষ্ট গোশত খেয়ে ফেলো।"[২০৮]

ধর্মীয় বিষয়ে সমাধানপ্রার্থীর অবস্থার ওপর ভিত্তি করে যা বেশি উপযোগী সে হিসেবেই তিনি ফতোয়া দিতেন : তিনি কখনো প্রশ্নকারীর সরাসরি উত্তর দিতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই পরিলক্ষিত হয়, যেমন খাসআমীয়ার তরুণী যখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন : "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর হজ্ব ফরজ করে দিয়েছেন, আর আমার পিতা ছিলেন খুবই বৃদ্ধ, উটের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তার পক্ষ থেকে কি আমি হজ্ব আদায় করে দেব? রাসূলূল্লাহ ﷺ বলেন: হাঁ",[২০৯] আবার কখনো জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ব্যাপারে সাধারণ ও অনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিতেন : যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ই'উলার হাদীসে এসেছে " নজদের কিছু লোক আরাফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে বললেন : হজ্ব হলো আরাফাহ।"[২১০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কর্মের প্রতি উৎসাহ প্রদানের সাথে তাঁর ফতোয়াকে যুক্ত করতেন। এর উদাহরণ, রাওহায় জনৈকা মহিলা একটি ছোট্ট শিশু উঁচু

করে ধরে বললেন, এর হজ্ব হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ হবে, আর ছোয়াবটা পাবে তুমি।" [২১১]

ফতোয়ার স্থানের বিভিন্নতাও লক্ষণীয় বিষয়। তিনি হজ্বযাত্রার পূর্বে মদীনায়,[২১২] এবং ইহরামের সময় যুলহুলায়ফায়,[২১৩] মসজিদুল হারামে,[২১৪] আরাফায়,[২১৫] মুযদালিফায়,[২১৬] মিনায়,[২১৭] হজ্বের পবিত্র স্থানসমূহে গমনাগমনের সময়,[২১৮] এবং মদীনায় ফেরার পথে ফতোয়া দিয়েছেন।[২১৯]

বর্তমানে ধর্মীয়জ্ঞান প্রচারে ও ফতোয়া প্রদানে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এক্ষেত্রে ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ এখনো ঘুরে বেড়ায়, প্রশ্ন নিয়ে, উদ্ভ্রান্ত হয়ে। গত্যন্তর না পেয়ে, বেশভূষায় পরহেজগার মনে হয় এ ধরনের লোকদের শরনাপন্ন হয়। এর অর্থ আরো গুরুত্বের সাথে নিতে হবে এ-বিষয়টি। যারা আলেম, ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী তাদেরকে যার যার ভাষায় সক্রিয় হতে হবে। প্রশ্নের উত্তর সরবরাহের নিমিত্তে, ও হুকুম আহকাম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে পথেঘাটে, আবাসনের স্থানসমূহে, তাদেরকে থাকতে হবে হাতের নাগালের মধ্যে। যাতে মানুষের মূর্খতা দূর হয়ে যায়, জাহেলদের ফতোয়া প্রদানের পথ বন্ধ হয় ও তাদের উৎসাহে ছন্দপতন ঘটে ।

এবিষয়ে সাধারণ মানুষেরও বোধ সৃষ্টি করতে হবে তারা যেন সত্যিকার আলেম ও দ্বীনদার ব্যক্তির কাছে প্রশ্ন করতে যান, প্রয়োজনীয় যাচাই করেন। তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে, যেকাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। ফতোয়াদানকারীদেরও মনে রাখতে হবে যে সঠিক জ্ঞান ব্যতীত ফতোয়া দেয়া মারাত্মক অপরাধ। এজাতীয় কাজ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মিথ্যাচারিতা বৈ অন্য কিছু নয়, আর এই মর্মে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা, যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।” [২২০] রাসুলূল্লহ ﷺ এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, “ আমার ওপর মিথ্যাচারিতা সাধারণ লোকদের প্রতি মিথ্যাচারিতার মতো নয়। যে আমার বিষয়ে ইচ্ছা করে মিথ্যা বলল সে যেন তার স্থান দোযখে প্রস্তুত করে নেয়।”[২২১]

৩- ওয়াজ ও উপদেশ

ওয়াজ-উপদেশ সংস্কারকদের দায়িত্বের একটি বড়ো অংশ, আল্লাহর পথে আহ্বায়কদের মূল পদ্ধতি। দৃঢ় প্রত্যয়ী রাসূলদেরকে আল্লাহ এমর্মে আদেশ করেছেন, তিনি মুসা عليه السلامকে খেতাব করে বলেছেন:

أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ

“বের করে নিয়ে এসো তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে, আল্লাহর দিবস বিষয়ে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও।”[২২২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

“ অতএব উপদেশ দাও, নিশ্চয় তুমি একজন উপদেশ দাতা।” [২২৩] ওয়াজ উপদেশই হলো মানুষের হৃদয়কে উদ্দেশ্য করে কথা বলার পদ্ধতি, তার ভাবাবেগকে উদ্দীপিত করার পথ। ওয়াজ-উপদেশ পদস্খলিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে, উদাসীনতা থেকে বের করে ঐকান্তিকতার সংস্পর্শে নিয়ে যেতেও এর ভূমিকা অপরিসীম। ওয়াজ ও উপদেশ মানুষের মনকে নরম করে, আলোকিত করে, ময়লা আবর্জনা ও কর্দমাক্ততা সরায়, এবং প্রতিপালকের বড়োত্ব হৃদয়ে সজাগ করতে প্রেরণা দেয়। আল্লাহর নির্দেশ বাস্ত

বায়নে দ্রুত এগিয়ে যেতে, নিষেধাজ্ঞা থেকে বেচে থাকতে সহায়তা করে। একারণে প্রতি ব্যক্তিরই এবিষয়টির প্রয়োজন। তবে এ থেকে কেবল সেই উপকৃত হয় যার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় রয়েছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে :" উপদেশ দাও, যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়।" [২২৪] আরো এরশাদ হয়েছে:" উপদেশ দিন নিশ্চয়ই উপদেশে মুমিনদের উপকার হয়।" [২২৫]

এজন্য উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিশেষ যত্ন ছিল, ওয়াজের প্রতিও তাঁর গুরুত্ব দৃষ্টিগ্রাহ্য। তিনি উম্মতকে যা কিছু ভালো তার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন, দুষ্কর্ম ও অকল্যাণ থেকে বারণ করেছেন, হুঁশিয়ার করেছেন। সাহবীদের কখন নসীহত করা উত্তম হতে পারে তার উপযুক্ত সময় তিনি খুঁজতেন।[২২৬] তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী নসীহতের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন, শুনে অশ্রু ঝরাতো চোখ, কম্পিত হতো হৃদয় ,[২২৭] আর এটা ছিল তাঁর দায়িত্বের একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এরই ইঙ্গিত রয়েছে, তিনি বলেন :" আমার উদাহরণ ও আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছেন তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো যে একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, অতঃপর বললেন : হে আমার সম্প্রদায়, আমি স্বচক্ষে শত্রু-সৈন্য দেখেছি, এবং আমি উলঙ্গ হুঁশিয়ারকারী। অতঃপর বাঁচো। তার সম্প্রদায়ের একদল লোক আনুগত্য করল ও রাতের আঁধারে বের হয়ে গেলো, তারা ধীরেসুস্থে রওনা হলো অতঃপর পরিত্রাণ পেয়ে গেলো। আর একদল অবাধ্য হলো এবং সেখানেই সকাল করল, শত্রু সৈন্য প্রভাতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের ধ্বংস করল, পিষ্ট করল। যে আমার ও আমি যা এনেছি তার আনুগত্য করল অথবা যে আমার অবাধ্য হলো ও আমি যা এনেছি তা অমান্য করল তার পরিণতি হবে ওপরে বর্ণিত উদাহরণের মতোই।"[২২৮]

হজ্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছিলেন মানুষদেরকে উপদেশ ও নসীহত দাতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াজ নসিহত ও উপদেশে যে মনোযোগ দিবে তার কাছে বেশ কিছু বিষয় প্রতিভাত হবে, যেমন :

ওয়াজ ও নসীহতের প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ, স্থান ও কালের বৈরিতার প্রতি লক্ষ্য। আরাফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াজ করেছেন এবং মানুষের হৃদয়কে

করেছেন আন্দোলিত।[২২৯] তিনি ওয়াজ উপদেশ করেছেন হজ্বের পবিত্র স্থানসমূহে যাতায়াতকালে,[২৩০] ১০ যিলহজে মিনায়,[২৩১] তাশরিকের দিনগুলোয়,[২৩২] মদীনায় ফেরার পথে। আর তা তিনি এজন্যই করেছেন যে হজ্বমৌসুমে উপদেশ ও নসীহত গ্রহণের জন্য মানুষের মন থাকে উন্মীলিত, প্রস্তুত।

তিনি ওয়াজ নসীহত করার যেকোনো সুযোগকে যথাযথ কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন অবস্থানের মাঝে যোগসূত্র কায়েম করেছেন, উদাহরণস্বরূপ তিনি ঈদের দিন বলেছেন: " তোমরা কি জানো এটা কোন দিন , আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ রইলেন, আমরা ভাবলাম তিনি হয়তো দিনটির নাম বদলে দিবেন। তিনি বললেন এটা কি য়াউমুননাহর নয় ? বললাম, হাঁ, য়াউমুননাহর। তিনি বললেন: এটা কোন মাস? বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ রইলেন, আমরা মনে করলাম তিনি হয়তো নাম বদলে দিবেন। তিনি বললেন : এটা কি জিলহাজ মাস নয়? আমরা বললাম , হাঁ, জিলহজ মাস। তিনি বললেন : এটা কোন অঞ্চল ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ রইলেন। আমরা মনে করলাম, তিনি হয়তো নাম পালটে অন্য নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি হারাম অঞ্চল নয় ? আমরা বললাম, হাঁ হারাম তথা পবিত্র অঞ্চল। তিনি বললেন: তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ, রক্ত, তোমাদের জন্য হারাম, তোমাদের এই দিবসের মতোই, এই মাসে এই অঞ্চলে, যতক্ষণ না তোমরা প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ কর।"[২৩৩] ১০ জিলহজ্বের কার্যসমূহে আগে পিছে করার ব্যাপারে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন : কোনো ক্ষতি নেই, কোনো ক্ষতি নেই, তবে যে তার মুসলমান ভাইয়ের সম্মানে আঘাত করল, মূলত সেই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।[২৩৪]
উপদেশের ক্ষেত্রে তিনি একই বিষয় বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ করিয়ে দিতেন। যেমন রক্ত সম্পদ সম্মান হারাম হওয়ার বিষয়টি আরাফায়,[২৩৫] ১০ যিলহজে [২৩৬] তাশরীকের দিবস সমূহে তিনি পুনর্বার ব্যক্ত করেছেন।[২৩৭] বরং এমন হয়েছে যে তিনি একই বিষয় এক জায়গায় কয়েকবার বলেছেন; উদাহরণস্বরূপ ইবনে

আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ য়াউমুননাহরে (১০ যিলহজ্ব) জনতাকে লক্ষ্য করে বক্তৃতা করেন, তিনি বলেন : হে লোকসকল! এটা কোন দিবস, তারা বলল : পবিত্র দিবস। তিনি বললেন : এটা কোন অঞ্চল ? তারা বলল হারাম তথা পবিত্র অঞ্চল। তিনি বললেন, এটা কোন মাস ? তারা বলল : হারাম তথা পবিত্র মাস। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের ওপর হারাম, এই দিবসের মতো, এই অঞ্চলে, ও এই মাসে। কথাটা তিনি তিনবার পুনব্যক্ত করলেন।

রাসূলের উপদেশ ও তাঁর কর্ম এ'দুয়ের মাঝে কোনো ছেদ না থাকাও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। তিনি যে বিষয়ে মানুষদেরকে উপদেশ দিতেন সে বিষয়ের প্রয়োগে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তিনি যা করতেন না তা বলতেনও না। তিনি কোনো কিছুর নির্দেশ দিলে সর্বাগ্রে তা নিজেই বাস্তবায়ন করতেন, কোন কিছু থেকে মানুষকে বারণ করলেন প্রথমে তা নিজেই পরিহার করতেন। তিনি ছিলেন সমধিক পরিমাণে আল্লাহকে ভয়কারী, স্রষ্টার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওয়াজে স্পষ্ট ছিলেন, কথা সরাসরি বলতেন। তিনি আড়ম্বরতা পরিহার করে কথা বলতেন। একারণে ওয়াজ-উপদেশে কোনো দুর্বোধ্য শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি, কঠিন ও সর্পিল কোনো পদ্ধতিরও আশ্রয় নেন নি।

তিনি ওয়াজ-উপদেশে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করতেন, মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতেন যা আখেরাতের মুক্তির জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে জরুরি। তিনি কখনোই ওয়াজ-উপদেশের মাধ্যমে কোনো কিছুকে কঠিন করতে চাইতেন না, অথবা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আলোচনায় আনতেন না।

ওয়াজ-উপদেশের ক্ষেত্রে কেবল নিজেই এ দায়িত্ব পালন করে ক্ষান্ত হননি, বরং জনতার মাঝে ডেকে ডেকে উপদেশ প্রদানের জন্যও লোক নির্ধারিত করেছেন। বিশর ইবনে সুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত : " রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাশিরিকের দিনসমূহে জনতার মাঝে ডেকে ডেকে বলতে বলেছেন : মুমিন ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" [২৩৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺএর ওয়াজ উপদেশের নির্ভরতা কেবল ভয় দেখানোয় সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি বরং সুসংবাদ ও উৎসাহিত করার পদ্ধতিকেও রীতিমত ব্যবহার করেছেন। মানুষদেরকে খোশখবরি শুনিয়েছেন। নীচের হাদীসটি তারই উদাহরণ :

"যে কেবল আল্লাহর জন্য হজ্ব সম্পাদন করল, এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত রইলো, শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হলো না সে তার মাতৃ গর্ভ থেকে জন্ম নেয়ার দিনের মতো হয়ে গেলো।" [২৩৯] মুযদালিফার দিন সকালে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহ তোমাদের এই জমায়েতের ওপর অনুকম্পা করেছেন , অতঃপর তোমাদের পাপীকে পুণ্যবানের কাছে সোপর্দ করেছেন, আর পুণ্যবানের সকল চাওয়া তিনি পূরণ করেছেন। তাই আল্লাহর নামে রওনা হও।" [২৪০]

তিনি ﷺ তাঁর ওয়াজ উপদেশে কথার গণ্ডি ছাড়িয়ে সরাসরি প্রয়োগে গিয়েছেন, তাইতো বাতনুল ওয়াদিতে - যেখানে আসহাবুল ফিলের ওপর আল্লাহর রোষ পতিত হয়েছিল - তিনি দ্রুত চলেছেন। এটা ছিল ওয়াদি মুহাস্‌সার, যেমন আলীর (রা) হাদীসে এসেছে:" তারপর তিনি চললেন এবং ওয়াদি মুহাস্‌সারে এসে পৌঁছোলেন, তিনি তাঁর উটকে আঘাত করলেন, সে দৌড়ে চলল এবং উপত্যকা অতিক্রম করল, ও দাঁড়াল।[২৪১] উক্ত ওয়াদিকে এভাবে নামকরণ করার কারণ আবরাহার হাতিগুলো এখানে এসে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, ফলে কাবা পর্যন্ত তাদের যাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হলো। ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, "আল্লাহর শত্রুদের ওপর যেখানে শাস্তি এসেছে সেখানে এরূপ করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাস।[২৪২] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওয়াজ উপদেশে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

দুনিয়া বিষয়ে মানুষদেরকে নির্লোভ করা : আরাফার দিন সূর্যাস্তের পূর্বে তিনি বললেন, হে লোকসকল! দুনিয়ার অতিক্রান্ত অংশের তুলনায় অবশিষ্ট

অংশ আজকের দিনের অতিক্রান্ত অংশের তুলনায় যতটুকু বাকি রয়েছে তার মতোই।" [২৪৩]

তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ ও বেহেশতে প্রবেশের কারণ হবে এমন আমলসমূহ দেখিয়ে দেয়া- হাদীসে এসেছে , "তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়, রমজান মাসের রোজা রাখো, এবং সম্পদের যাকাত দাও, নেতার আনুগত্য করো, তবে তোমাদের প্রতিপালকের বেহেশতে প্রবেশ করবে।[২৪৪]

কেউ কারও পাপের বোঝা টানবে না, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা ও দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত,এ বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া- এরশাদ হয়েছে : জুলুমকারী কেবল নিজের ওপরেই জুলুম করে, পিতা ছেলের ওপর জুলুম করে না, না ছেলে পিতার ওপর।"[২৪৫]

ভালো চরিত্র, ভালো কাজ , ও হজ্ব পালনে শরীয়তবর্জিত ও গোনাহের কাজ থেকে বেচে থাকা ও কল্যাণকর কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখার বিষয়ে উৎসাহ দান - এরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি হজ্ব করল এবং যৌনতার স্পর্শে গেলো না, শরীয়তপরিপন্থী কোনো কাজও করল না, সে মাতৃ গর্ভ থেকে সদ্যজন্ম নেওয়া শিশুর মতো ফিরে এলো", [২৪৬] তিনি আরো বলেছেন, " ঘোড়া অথবা উটকে জোরে হাঁকিয়ে নেয়াতে কল্যাণ নেই।"[২৪৭] হজ্বে কল্যাণকর কাজ কী? জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "খাবার খাওয়ানো ও ভালো কথা বলা"। [২৪৮]

প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক করা- এরশাদ হয়েছে, "হে লোকসকল! ধর্মে বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান, নিশ্চয়ই ধর্মে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে।"[২৪৯]

মাতা-পিতার সাথে সদাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ- এরশাদ হয়েছে, "(তোমার সদাচার পাওয়ার অধিকারী) তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার ভাই, তোমার বোন, অতঃপর নিকট আত্মীয়রা পর্যায়ক্রমে।"[২৫০]

মহিলা ও অন্যান্য দুর্বলদের প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ- "মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আল্লাহর নিরাপত্তায় তোমরা তাদের নিয়েছ এবং আল্লাহর বাণী দিয়ে তাদের স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বৈধ অধিকার পেয়েছ।"[২৫১] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে "মহিলাদের বিষয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী হও কেননা এরা তোমাদের কাছে বাঁধা।"[২৫২]

অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, আনুগত্যের ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টাসাধনা ও পাপ পরিত্যাগের ব্যাপারে উৎসাহ দান - বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "মুমিন কে? এ বিষয়ে কি আমি তোমাদের বলব না? যাকে মানুষ তাদের জান-মালের বিষয়ে নিরাপদ মনে করে, সেই মুমিন। আর মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে। আর মুজাহিদ সেই যে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আর হিজরতকারী সে যে পাপ ও ত্রুটিকে বর্জন করে।" [২৫৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পক্ষ থেকে তাবলীগ তথা পোঁছিয়ে দেয়ার বিষয়েও উৎসাহ দিয়েছেন এবং তার ওপর কোন মিথ্যাচারিতা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন :" আল্লাহ পাক উজ্জ্বল করুন ওই ব্যক্তির চেহারা যে আমার কথা শুনল, ও তা পোঁছিয়ে দিল। অনেক 'ফিকহ' বহনকারী নিজে ফকিহ নয়, আবার অনেকেই ফিকহ এমন ব্যক্তির কাছে বহন করে নিয়ে যায় যে তার চেয়েও বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি আরো বলেছেন : "তোমরা আমাকে দেখলে শুনলে। তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, অতঃপর যে আমার ওপর মিথ্যা বলবে সে যেন তার স্থল নরকে প্রস্তুত করে নেয়।"[২৫৪]

আকুতি মিনতি মোনাজাত ও দোয়ায় শ্রম-সাধনার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা প্রাপ্তি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণ। বর্ণনায় এসেছে : "আরাফা দিবসের মতো অন্য কোন দিন এতো অধিক পরিমাণে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে মুক্তি দেন না, আর এদিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন। এবং তার বান্দাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন ও বলেন, ওরা কি চায়?।" [২৫৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি আবুবকর, ওমর, আশারায়ে মুবাশ্শারা, আহলে বদর, হুদায়বিয়ার বায়আতকারীগণ ও অন্যান্য সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উপদেশ দিতে এতো শ্রম-সাধনা ব্যয় করে থাকেন , এবং তাদের এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়াজ- উপদেশ দিয়ে থাকেন যার দ্বারা হৃদয়ে ত্রস্ততা আসে, মন কাঁপে, অশ্রু ঝরে; এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করেন ও এ-উদ্দেশ্যে আহ্বায়ক পাঠান; পক্ষান্তরে তারা হলেন এ-উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ, সমধিক স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, সবচেয়ে বেশি অনাড়ম্বর, সত্যবাদী, সঠিকতম হেদায়েতে প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরতম অবস্থায় অধিষ্ঠিত, যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর নবীর সহবত ও ইকামতে দ্বীনের জন্য চয়ন করেছেন; তাদেরকে ওয়াজ-উপদেশ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটুকু হন তাহলে হজ্বে আমাদের এ সবের কতই না প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের অনেকেই জাহেল, উদাসীন। অনেকেই পাপী, মূর্খ। আবার অনেকের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে পশুপ্রবৃত্তি খুব শক্তভাবে। অনেককে আবার সন্দেহ ও অস্পষ্টতা ঘিরে রেখেছে চতুর্দিক থেকে।

সন্দেহ নেই, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশাল দায়দায়িত্বের দাবিবহ, বরং এর প্রয়োজনীয়তা খাদ্য ও পানীয়ের থেকেও অধিক। কেননা প্রয়োজন দরজায় কড়া নাড়ছে, আর শূন্যহৃদয়সমূহ রয়েছে আগ্রহে অপেক্ষা-মান। তাই শক্তি-সামর্থ্য আছে এমন প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত ওয়াজ উপদেশের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়ানো। সুযোগ যথার্থভাবে কাজে লাগানো। হয়তো মৃত হৃদয় জীবন-স্পন্দন অনুভব করবে নতুন করে, জেগে উঠবে ঘুমন্ত মন। যার ফলে ঈমান পাবে সজীবতা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের সংখ্যা পাবে আধিক্য, নত হবে তার সামনে অনেকেই, অতঃপর তারা পরিণত হবে হিদায়েতের কান্ডারিতে, কারণ হবে উম্মতের মধ্যে নতুন আলোক জ্বলার কারণ।

৪-অনুসরণের দীক্ষা এবং দ্বীন গ্রহণের উৎসের অভিন্নতার প্রতি তাগিদ :

ইসলাম এক-আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর একচ্ছত্র দাসত্বে নিজেকে সঁপে দেয়ার নাম। রাসূল যা এনেছেন তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের নাম -

কেননা ইসলামের বলয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ দৃঢ়তা পায় না, প্রত্যাদিষ্ট টেক্সট সবটুকু মেনে নিতে যতক্ষণ না সে প্রত্যয়ী হয়। অভ্যন্তর ও বাহির-কে- কোনো প্রশ্ন না করেই- তার সাথে মিশ্রিত করে দেয়। এ-দিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কোরআনে এসেছে :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ভার তোমার ওপর অর্পণ করবে, এবং তোমার সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরনে মেনে নেবে সে বিষয়ে তাদের হৃদয়ে কোনোরূপ দ্বিধা অনুভব না করে।" [২৫৬] এ সম্পর্কে এক-হাদীসে এসেছে :" তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অনুগত হয়।"[২৫৭] ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন :'মুসলমানগণ ইজমা করেছেন যে, যার সামনে রাসূলুল্লাহর সুন্নত প্রকাশ পাবে - অন্য কারো কথার নির্ভরতায় - তা উপেক্ষা করা বৈধ হবে না।'[২৫৮]

হজ্ব আনুগত্য প্রকাশের এক পবিত্র নিদর্শন। আত্মসমর্পণ ও বিনয় প্রকাশের বিদ্যালয়। নবী , তিনি-ই যে একমাত্র অনুসরণের পাত্র, এ-দীক্ষা লাভের এক নির্মল শিক্ষাগার। যেখানে রাসূল তাঁর সাহাবাদেরকে শিখিয়েছেন কীভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে একনিষ্ঠ হয়ে। তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করেছেন তাঁকে অনুসরণ ও ইকতিদা করার প্রেরণা। জাবের (রা) এ-ধরনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে। তাঁর ওপর কোরান নাযিল হচ্ছে- আর এর ব্যাখ্যা তিনি জানেন-। তিনি যা কিছু করেছেন আমরাও তা করেছি।"[২৫৯] রাসূলের এই গুরুত্বপূর্ণ দীক্ষার তরতাজা দৃষ্টান্ত হলো :

ক. ওমর ফারুক (রা) যিনি হাজরে আসওয়াদের সংস্পর্শে এলেন, চুম্বন করলেন ও বললেন : "আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি কেবলই একটি পাথর। উপকার অথবা অনুপকার কোনোটিরই ক্ষমতা তোমার নেই । রাসূলুল্লাহ ﷺ কে

চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।" [২৬০] তিনি অন্য-একদিন বললেন : "আজ রমল ও স্কন্ধ নিরাবরণ কেন? ইসলামকে তো আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, এবং কুফর ও কাফেরদের দমন করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো বিষয়কে আমরা বাদ দিব না যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে করতাম " [২৬১] অন্য-এক বর্ণনায় " আল্লাহর কসম , আমরা এমন বিষয়কে ছেড়ে দিব না যা রাসূলুল্লাহর যুগে করতাম...।"[২৬২]

খ. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তামাত্তু তামাত্তু হজ্ব বিষয়ে যিনি হযরত উসমানের (রা) সাথে মতানৈক্য করলেন – উসমান (রা) তখন খলিফা ছিলেন এবং তামাত্তু পদ্ধতিতে হজ্ব পালন থেকে বারণ করতেন, তা সত্ত্বেও হযরত আলী হজ্ব ও ওমরা একসাথে তামাত্তু হিসেবে আদায়ের নিয়ত করে বললেন :" لبيك بحجة وعمرة معا শুনে হযরত উসমান বললেন : আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি এটা করছ? উত্তরে আলী (রা) বললেন :" কোনো মানুষের কথা মানতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত ছেড়ে দিতে পারি না।"[২৬৩]

গ. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যিনি তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের সময় বলতেন : "হে আল্লাহ ! তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখে, তোমার কিতাবকে সত্য জেনে , এবং তোমার রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ কল্লে।"[২৬৪] তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা, ও রুকনে য়ামানী স্পর্শ করা কখনো পরিত্যাগ করতেন না–কঠিন অথবা সহজ কোনো অবস্থাতেই না– যখন থেকে রাসূলুল্লহকে ﷺ তা করতে দেখেছেন। [২৬৫] মুজাহিদ বলেন :"আমি তাঁকে একবার দেখলাম ভিরে ঠেলাঠেলি করতে, এমনকী তাঁর নাসিকা আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং নাসা রন্ধ্র বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। যখন এক ব্যক্তি তাঁকে হাজরে অসওয়াদ স্পর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তিনি বললেন "আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ স্পর্শ করতে ও চুম্বন করতে দেখেছি , লোকটি বললেন : যদি ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যাই, যদি পরাহত হই? তিনি বললেন : তা সত্ত্বেও। অরপর এক ব্যক্তি

যখন তামাত্তুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন. তিনি বললেন : ওটা বৈধ, লোকটি বলল , আপনার বাবা তো বারণ করতেন । তিনি বললেন : দেখুন! আমার বাবা যদি নিষেধ করে থাকেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ করতে বলে থাকেন, তাহলে আমার বাবার নির্দেশ মানা হবে, না রাসূলুল্লাহর ﷺ ? লোকটি বললেন, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিদেশই মানতে হবে। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন।" [২৬৬] অন্য আর-এক ব্যক্তি যখন বললেন : ইবনে আব্বাস তো বলেন : আরাফায় আসার আগে বায়তুল্লাহর তোয়াফ করো না, ইবনে ওমর বললেন : " রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্ব করেছেন, তিনি আরাফায় যাওয়ার পূর্বেও বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন । তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা মানব না ইবনে আব্বাসের (রা) কথা, আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।" [২৬৭]

ঘ. এ-উম্মতের আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যিনি হযরত মায়াবিয়া (রা) কে পবিত্র কাবার চতুষ্কোণ স্পর্শ করতে দেখে বলেছেন - আপনি কেন এই কোণদ্বয় স্পর্শ করছেন, রাসূল্লাহ ﷺ তো এ-দুটো স্পর্শ করেননি । উত্তরে হযরত মায়াবিয়া বললেন : কাবার কোনো অংশই পরিত্যক্ত নয়। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন,

" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "

(রাসূলুল্লাহর জীবনীতে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে)।[২৬৮] হযরত মায়াবিয়া বললেন : তুমি সত্যই বলেছ। তিনি হজে-তামাত্তু বৈধ মনে করতেন, তাঁকে বলা হতো, আবুবকর ও ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তো তা করতেন না। উত্তরে তিনি বলতেন : " আল্লাহর কসম আমার তো মনে হয় আল্লাহ আপনাদেরকে শাস্তি দিবেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীসের উদ্বৃত্ত দিচ্ছি আর আপনারা আবুবকর ও ওমরের কথা বলছেন।"[২৬৯]

হজ্বে রাসূলুল্লাহর আদর্শ অনুকরণ ও কেবল ওহির উৎস থেকে অনুশাসন গ্রহণের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়ার দৃষ্টান্ত বহু, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক. হজ্বমৌসুমে বিভিন্ন স্থানে হাজ্বীদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আদর্শ অনুকরণ করতে বলেছেন। তাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন এ আশংকায় যে হতে পারে এটাই তাঁর শেষ হজ্ব। তিনি বার বার বলেছেন : " আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্বকর্মসমূহ জেনে নাও, কারণ হয়তো এ হজ্বের পর আমার আর হজ্ব করা হবে না।"[২৭০]

খ.আরাফার খুতবায় তিনি আল্লাহর গ্রন্থ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, কেননা ইহাই পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী থেকে বাঁচার উপায়, বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে গিয়েছি এমন বিষয় যা ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, আর তাহলো আল্লাহর কিতাব।"[২৭১]

গ. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন থেকে হুঁশিয়ার করেছেন, তিনি আরাফায় অবস্থানের সময় বলেছেন : "আমি হাউজে তোমাদের পূর্বেই চলে যাব, এবং তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব, অতঃপর আমার চেহারা কালিমাবৃত করো না, -----অতঃপর আমি বলব হে প্রতিপালক ! আমার সাথিরা! তিনি বলবেন : তুমি জানো না তোমার পর ওরা কি করেছে।"[২৭২]

ঘ. রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে (রা) হজ্বের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ও এ সবে বাড়াবাড়ি থেকে হুঁশিয়ার করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এক বর্ণনায় এসেছেঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাবার দিবসের সকালে বলেছেন- তিনি তখন উটের ওপর ছিলেন : আমার জন্য কঙ্কর কুড়াও, ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য, আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করা যায়, এমন সাতটি কঙ্কর কুড়ালাম। তিনি তাঁর হাতে সেগুলো ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বললেন : এগুলোর মতো নিক্ষেপ করো। এরপর তিনি বললেন : "হে লোকসকল ! ধর্মে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে

থাকো, কেননা ধর্মে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" [২৭৩]

ঙ. হজ্বের পবিত্রস্থানসমূহে গমনাগমনের সময় তিনি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ও তাঁর চাচাতো ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (রা)- যাদের তিনি সমীহ করতেন- তাঁর উটে সহ-আরোহী করে নেন, যাতে তারা তাঁর অনুসরণ করতে পারেন এবং পথিমধ্যে যা দেখেন ও শোনেন সে-বিষয়ে মানুষদেরকে, পরবর্তীতে, বলতে পারেন। এজন্য হযরত উসামাকে আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত সহ-আরোহী বানালেন, মানুষেরা বলল 'আমাদের এই সঙ্গী -রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করলেন- সে বিষয়ে বলবে' একইভাবে যখন মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযল ইবনে আব্বাসকে (রা) সহ আরোহী করলেন মানুষেরা বলল : 'আমাদের এই সঙ্গী রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করলেন সে সম্পর্কে জানাবে।' [২৭৪]

সাহাবীদের দীক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যে বিষয়টি সবচেয়ে বড়ো বলে আমার কাছে মনে হয় তাহলো আদর্শ গ্রহণের উৎসের অভিন্নতার প্রতি তাগিদ : যারা কোরবানির পশু সঙ্গে আনেনি- রাসূলুল্লাহর সঙ্গে-আসা অধিকাংশ এই পর্যায়ের ছিলেন- তাদেরকে ইহরাম ছেড়ে হালাল হতে বাধ্য করলেন যখন তিনি কোন-এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : "অতঃপর আরাফায় এ অবস্থায় যাব যে আমাদের শিশ্ন বেয়ে তখনো রেত স্খলিত হচ্ছে।"[২৭৫] ঘটনাটি এরকম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদেরকে বললেন, যারা হাদীর পশু সঙ্গে করে আনেনি তারা হালাল হয়ে যেতে পারে এবং স্ত্রীদের সংসর্গে যেতে পারে। এই মর্মে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফু হাদীসে এসেছে : "তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ আদায়ের পর বললেন : যে ব্যক্তি এটাকে ওমরায় রূপান্তরিত করতে চায় সে যেন এটাকে ওমরায় রূপান্তরিত করে ফেলে।" [২৭৬] জাবের (রা) এর হাদীসে একই বিষয় ব্যক্ত হয়েছে : তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদের হজ্বযাত্রাকে ওমরায় রূপান্তরিত করার অনুমতি দেন, তাঁরা বায়তুল্লাহর তোওয়াফ করবে ও চুল কর্তন করে হালাল হয়ে যাবে, কেবল যার সাথে কোরবানির পশু রয়েছে সে ব্যতীত।"[২৭৭] এক্ষেত্রে জাবের (রা) এর মন্ত

ব্য হলো, " রাসূলুল্লহ ﷺ এ-বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেন নি, বরং কেবল অনুমতি দিয়েছেন ", [২৭৮] এর পর তিনি ﷺ শুনলেন এমন কথা যাতে বক্তার 'হজ্বের মাসসমূহে ওমরা বৈধ নয়' বলে মুশরিকদের যে আচার ছিল তাতে প্রভাবিত হওয়ার গন্ধ রয়েছে, মুশরিকরা এ-জিনিসটিকে জঘন্যতম কাজ বলে মনে করতো,[২৭৯] এটা একপ্রকার আদর্শ গ্রহণ বৈকি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে উৎসের অভিন্নতার ওপর তাগিদ করে, সাহবাদেরকে হালাল হতে বাধ্য করলেন, যাতে আদর্শ গ্রহণ শুধুমাত্র রাসূল থেকেই হয়। সাহাবাগণ সাড়া দিলেন ও আনুগত্য করলেন। [২৮০]

বর্তমানে মানুষের হাল-অবস্থায় দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বিদআত তার শেকড় ছড়িয়ে রেখেছে সর্বত্র। গোমরাহীর উত্তাল তরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হজ্বকৃত্যপালনকারী অনেককেই। আর এই অনাকাঙ্ক্ষিত গহ্বর ভরাট করা, ও ত্রুটি থেকে উত্তরণ ঘটানো রাসূলুল্লাহকে একক উৎস হিসেবে মেনে নেয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। ওলামা ও দোয়াতদের কাজ হবে উম্মতকে এ বিষয়ে দীক্ষিত করে তোলা। আর হজ্ব এক সুবর্ণ সুযোগ যেখানে মনকে বাধ্য করা যায় কেবল রাসূলুল্লাহর কাছ থেকেই আদর্শ গ্রহণ করতে, এবং অন্য যেকোনো উৎসকে বর্জন করতে।

তাই আপনি যদি পরিত্রাণ প্রাপ্তিতে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকেন তাহলে আদর্শপুরুষদের পথে চলুন। নিজেকে দিয়েই প্রথমে শুরু করুন। রাসূলুল্লাহﷺ এর অনুসরণের গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে ফেলুন। হজ্ব থেকেই শুরু হোক আপনার শুভ যাত্রা। কেননা এটাইতো আপনার সকল ধর্মব্রত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার মূল ভিত্তি, বেহেশতে প্রবেশের পূর্বশর্ত। হাদীসে এসেছে : "আমাদের অনুমোদন নেই এমন কাজ করলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত।" [২৮১] হাদীসে আরো এসেছে :"আমার গোটা উম্মতই বেহেশতে প্রবেশ করবে কেবল অস্বীকারকারী ব্যতীত। জিজ্ঞাসা করা হলো: কে অস্বীকারকরী হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন : যে আমার আনুগত্য করল সে বেহেশতে প্রবেশ করল আর যে অবাধ্য হলো সেই অস্বীকার করল।" [২৮২]

৫-উম্মতের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সতর্ক করণ :

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি, তাদের সবার হৃদয়কে একসূত্রে বেঁধে দেয়া, বিচ্ছিন্ন টুকরো গুলো একত্রিত করা, তাদের কাতারসমূহ সুসংহত করা ইসলামের একটি বড়ো উদ্দেশ্য। আর তাই ঐক্য ও সংহতি বিষয়ে কোরআন সুন্নায় বহু বাণী বিধৃত রয়েছে যেখানে পারস্পরিক বিরোধ ও বিসংবাদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে: এরশাদ হয়েছে :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না;"[২৮৩]

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

"নিশ্চয়ই তোমাদের এ উম্মত এক উম্মত, ও আমি তোমাদের প্রতিপালক অতঃপর আমাকে ভয় করো;" [২৮৪]

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"তোমরা মুশরিকদের দলভুক্ত হয়েও না, যারা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হলো, প্রত্যেক দল যা তাদের রয়েছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট।"[২৮৫] হাদীসে এসেছে : মুমিন মুমিনের জন্য প্রাসাদের মতো যার একাংশ অন্য অংশ ধরে রাখে, এই বলে তিনি আঙ্গুলসমূহ পরস্পরে প্রবিষ্ট করলেন।" [২৮৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : "আল্লাহর হাত জামাতের সাথে।" [২৮৭]

ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে পরিত্রাণ, সংহতি-ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি, ঐক্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ক্ষেত্রে হজ্বের প্রতিটি পর্বে যেহেতু প্রেরণা ও অনুভূতি রয়েছে, তাই,

এদিকটির ওপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ সমধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো নিম্নরূপ-

ক. উম্মতের সদস্যদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও তাকওয়া ব্যতীত অন্য কোনো ইস্যুতে পার্থক্য না করার তাগিদ। হাদীসে এসেছে : "তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক, জেনে রাখো আরবির আজমির ওপর কোনো মর্যাদা নেই। না রয়েছে আজমির আরবির ওপর, কালোর লালের ওপর, লালের কালোর উপর কোনো প্রাধান্য তবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।"[২৮৮]

খ. যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করে রাসূলুল্লাহ এমন কর্ণধারদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ﷺ উম্মতের বৃহৎ অংশের সাথে এঁটে থাকতে বলেছেন, ও গোটা উম্মতের জন্য কল্যাণ কামনা করতে বলেছেন, হাদীসে এসেছে : 'যদি নত-নাশিকাসম্পন্ন কালো দাসকে তোমাদের আমীর বানিয়ে দেয়া হয়, যে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে, তোমরা তার আনুগত্য করো ও কথা মেনে চলো,। তিনি মিনার খায়ফে বলেছেন, "তিন বিষয়ে মুমিনের হৃদয় খিয়ানত করতে পারে না: ধর্মকৃত্যে আল্লাহর জন্য ইখলাস ও ঐকান্তিকতা, মুসলমানদের সরকারপ্রধানদের জন্য শুভকামনা ও নসীহত, এবং মুসলমানদের বড়ো-জামাতের সাথে এঁটে থাকা, কেননা তাদের দোয়া তাদের পরিবেষ্টিত করে আছে পশ্চাৎ থেকে।" [২৮৯]

গ. শয়তানের প্রবঞ্চনায় পতিত হওয়া থেকে তিনি সতর্ক করেছেন, বর্ণনায় এসেছে "জজিরায়ে আরাবিয়ার মুসল্লীদের কর্তৃক পূজিত হবে এ-বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়েছে , তবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দিবে।"[২৯০]

ঘ. ধর্মে নতুন বিষয় সংযোজন করা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন : এই মর্মে তিনি উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন : "আমি কিছু মানুষকে নিষ্কৃতি দিবো এবং কিছু মানুষকে আমা হতে নিষ্কৃত করা হবে , অতঃপর আমি বলব, হে

আমার প্রতিপালক আমার সাথিরা ! আল্লাহ্ বলবেন জান না তারা তোমার পর কী করেছে।"[২৯১]

ঙ. ফেরকা ও বিভিন্ন দলে বিভক্তির কারণ হয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এমন বিষয় থেকে তিনি বারণ করেছেন, যেমন পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি, বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদেরকে চুপ করতে নির্দেশ দেয়ার পর তিনি বললেন : " আমার পর তোমরা কুফরে ফিরে যেয়ো না যে একে অন্যের গ্রীবায় আঘাত করবে।"[২৯২]

অন্যদের জান-মাল ও সম্মানের বিষয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে তিনি হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি আরাফা, ১০ যিলহজ ও তাশরিকের দিনের খোতবায় তাগিদ করে বলেছেন : "তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের মাঝে হারাম। এই দিনের মতো এই মাসে ও এই অঞ্চলে।"[২৯৩]

অন্যায় ও অন্যের সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া থেকেও তিনি বারণ করেছেন : "আমার কথা শোনো, তোমরা ভালোভাবে জীবনযাপন করবে, জুলুম করো না, জুলুম করো না , জুলুম করো না; কোনো মুসলমানের সম্পদ বৈধ হবে না যদি সে স্বেচ্ছায় না দেয়।"[২৯৪]

মুসলমানের গীবত ও তার সম্মানে হাত বাড়ানো থেকেও তিনি সতর্ক করেছেন : রাসুল্লাহ ﷺ কে যখন ১০ যিলহজের কার্যসমূহে আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন "কোনো সমস্যা নেই , কোনো সমস্যা নেই তবে ওই ব্যক্তি সমস্যাগ্রস্ত ও ধ্বংস হলো যে মুসলমান ব্যক্তির ইজ্জতে অন্যায়ভাবে আঘাত হানল।"[২৯৫]

চ. দজ্জাল থেকে তিনি উম্মতকে সতর্ক করেছেন, তিনি ﷺ বলেছেন:"আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীই দজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন, ..সে তোমাদের মধ্যে বের হবে, তার পরিচয় যদি গোপন থাকে তাহলে তোমাদের প্রতিপালকের পরিচয় তো তোমাদের কাছে জানা, তোমাদের প্রতিপালক কানা নয়, পক্ষান্তরে দজ্জালের ডান চোখ হবে কানা, যেন ভাসমান আঙ্গুরের মতো।

আজ দেখা যায় মতানৈক্য, দ্বেষ, বাদানুবাদ ও দলাদলিতে উম্মতের শরীর হয়ে আছে বিক্ষত। খরগ হাতে ফেতনা তাদের সিনায় বসা। অন্য পক্ষে ধর্মদ্রোহীদের অভিলাষ-পরিকল্পনার কারণে, উম্মতের ঐক্যের প্রোগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে বারংবার। আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত বর্তমানে উম্মতের ঐক্য ও সংহতির অন্য কোনো পথ বাকি নেই; যা ইতিপূর্বে উম্মতের টুকরো অংশগুলোকে একত্রে রাখার দৃঢ় ইতিহাস গড়েছে । হজ্ব গন্তব্য পথে যাত্রা শুরুর একটি উপযুক্ত সময়। কেননা লক্ষ লক্ষ মানুষের মন ও শরীর অভিন্ন বাণীর ওপর একত্রে রয়েছে এখানে। যদিও ভাষা দেশ সংস্কৃতি বয়স আর্থসামাজিক অবস্থান ইত্যাদিতে একজন অপর জন থেকে ভিন্ন।

আপনি যদি হজ্বকারী হয়ে থাকেন তাহলে এ কাজে হাত দেয়ার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট সময়, কেননা জাহিলিয়্যাতের সকল রসম রেওয়াজ থেকে আপনি এখানে নিজেকে পবিত্র করে নিতে পারেন। ওগুলোর স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে দাঁড় করাতে পারেন সত্যের মহা সড়কে। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কে যোগ করতে পারেন নতুন মাত্রা। আল্লাহর সাথে আপনার প্রযুক্ততাকে করতে পারেন আরো গভীর-নিবিড়-মজবুত। তিনি যাকে ভালোবাসেন আপনি কেবল তাকেই ভালোবাসবেন, তিনি যাকে ঘৃণা করেন আপনিও তাকে ঘৃণা করবেন। এবং এ ভালোবাসাকে আপনি প্রকাশ করবেন ও ছড়িয়ে দিবেন হাজ্বীদের মাঝে। তাদেরকে আপনার মতোই পদক্ষেপ নিতে বলবেন, আপনি সারা জীবন এ মহব্বতের বলয়ে নিজেকে ধরে রাখবেন, তার দাবি অনুযায়ী আমল করবেন। মুমিনদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, তাদের জন্য ঠিক তাই পছন্দ করবেন যা করে থাকেন নিজের জন্য। যদি আপনি এরূপ করতে পারেন, তবে মনে করতে হবে সরল পথের সন্ধান পেয়েছেন , কল্যাণের আঁচলে হাত রেখেছেন। বচন ও স্লোগানের পর্যায় পেরিয়ে এসেছেন কাজের বাস্তব ময়দানে, কদম রেখেছেন উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার শিল্পিত সোপানে।

৬- সফল নেতৃত্ব ও সুন্দর আচরণ

আল্লাহ তার রাসূলকে পূর্ণতম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সাজিয়েছেন। সুন্দরতম আদব আখলাখে বিকশিত করেছেন। তাই তিনি সফল নেতৃত্বের সকল উপকরণ নিজেতে ধারণ করেছেন। আচরণের সর্বোত্তম চাদরে জড়িয়েছেন স্বীয় সত্তাকে। ফলে ঝুঁকে পড়ল তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয়। ভির জমে গেলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের ইচ্ছে করেছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই, সবাই তাঁর তত্ত্বাবধানে, পতাকা তলে চলতে চায়। ফলে তার সঙ্গী হলো অসংখ্য মানুষ, যাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন- কারো কারো মতে এক লক্ষেরও বেশি- [২৯৬] সবার ইচ্ছা একটাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুকরণ করা, তিনি যেরূপ করেন সে-রূপ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেললেন, তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিলেন সুন্দরভাবে , পরিচালনা করলেন অশ্রুতপূর্ব শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিতে।

শব্দের এই সীমিত অবকাঠামোয়, এ-বিশাল জমায়েতকে নেতৃত্ব, পরিচালনা ও তাদের সাথে সদাচার প্রদর্শনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তার সবকটি দিক যথার্থভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয় জেনে কয়েকটি বিষয় কেবল ইঙ্গিতের ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব যাতে পাঠক নবী-নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও আচরণের মহানুভবতার বিষয়ে সামান্য ছোঁয়া পান।

ক. সর্বোত্তম আদর্শিক নমুনা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন

প্রয়োগে না গিয়ে কেবল কথার গোলাপ ছড়ানোর দোষে যারা দুষ্ট তাদের বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

" তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের ব্যাপারে হও স্মৃতিভ্রষ্ট ! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?"[২৯৭]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

" হে মুমিনগণ তোমরা যা করো না তা কেন বল, তোমরা যা করনা তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় অসন্তোষজনক" [২৯৮] আর যেহেতু কোরআনই ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ চরিত্র, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কোনো নির্দেশ দিতেন না যতক্ষণ না অন্য সবার পূর্বেই তা তিনি বাস্তবায়ন করে নেন। একইরূপে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করতেন না যতক্ষণ না নিজে তা থেকে অবস্থান নিতেন বহু দূরে। হজ্বে নবীচরিত্রের এই উজ্জ্বল দিকগুলো বিচিত্র ধারায় প্রকাশ পেয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* বিদায় হজ্বের খোতবায় তিনি বলেছেন, " জেনে রাখো! জাহেলী যুগের সকল বিষয় আমার এ দু'পায়ের নীচে রাখা । আর আমাদের হত্যাসমূহের মধ্যে প্রথম হত্যা যা রহিত করছি ইবনে রাবিয়া ইবনে হারেসের হত্যা, সে বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধপায়ী থাকা অবস্থায় হোযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহিলীযুগের সুদ রহিত হলো । আর প্রথম সুদ যা রহিত করছি আমাদের সুদ; আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেবের সুদ, এটা রহিত হলো।"[২৯৯]

* রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর সাহাবাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন হজ্বে কল্যাণকর কাজের বিষয়ে, ইবাদত বন্দেগী , আল্লাহর সামনে খুশু খুজু বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্য, তখন তিনি ছিলেন ভয়ে-ত্রস্তে আল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি. বিনয় ও নম্রতায় সর্বাগ্রে, আকুতি ব্যাকুলতা ও স্রষ্টার সামনে দীনতা প্রকাশে সর্বোর্ধ্বে।[৩০০]

* তিনি যখন তার সাহাবাদেরকে দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ ও পরকালের প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন তখন তিনি একটি জীর্ণ গদি ও চার দিরহাম মূল্যেরও হবে না এমন একটি চাদরের ওপর ছিলেন।[৩০১]

* তিনি যখন ধাক্কাধাক্কি বর্জন করে ধীরে-সুস্থে হজ্বকর্ম পালনের নির্দেশ দেন সে-সময় তাঁকে দেখা গেলো অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ও শান্ত হয়ে আরাফা থেকে প্রস্থান করতে , তাঁর চলার গতিও ছিল মন্থর।[৩০২]

* তিনি যখন চুল কর্তন ও মাথামুণ্ডন উভয়টার বৈধতা প্রকাশ করলেন, এবং মাথামুণ্ডন ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দিলেন ও মুণ্ডনকারীদের জন্য দোয়া করলেন তখন তিনি রীতিমতো মুণ্ডনকৃত অবস্থায় ছিলেন ।[৩০৩]

* তিনি যখন ধর্মে বাড়াবাড়ি থেকে সাহাবাদেরকে বারণ করলেন এবং আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করা যায় এমন কঙ্কর নিক্ষেপ করতে বললেন, তখন তিনি একই রকম কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। [৩০৪]

এটা অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কাকতালীয়ভাবে নয় বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বেচ্ছায় সাগ্রহে নিজেকে উত্তম আদর্শের নমুনা বানিয়ে উপস্থাপন করেছেন। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন তিনি পানি পান করানোর কাজে নিয়োজিতদেরকে বললেন, “মানুষ তোমাদের ওপর অতি মাত্রায় ভির করবে এ-ভয় না হলে আমি তোমাদের সাথে পানি উঠতাম।” [৩০৫]

এ-জাতীয় বিষয়ই মানুষের ভালোবাসা কুড়িয়ে এনেছে, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। কেননা এটা হলো ঐকান্তিকতা ও নেতৃত্বের উৎকর্ষতার আলামত, এবং যা অন্যদেরকে করতে বলা হচ্ছে তাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও বাস্তবায়নে একনিষ্ঠতার পরিচয়।

কতই না সুন্দর হবে যদি দ্বীনের পথে আহ্বায়কগণ (দাঈ) এ মহিমান্বিত চরিত্র মাধুরী আত্মস্থ করে নেয়, তাদের নিজস্ব জীবনে এর যথাযথ অভিব্যক্তি ঘটায়, অন্যদের জন্য উত্তম আদর্শ স্থাপন করতে সমর্থ হয় সকল কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হজ্ব -মৌসুমে। অতঃপর ভালো কাজ- যার নির্দেশ তারা অন্যদেরকে দেয় -- সম্পাদনে তারা হয়ে যায় সর্বাগ্রে। আর অন্যায় কাজ -যা থেকে অন্যদেরকে বারণ করছে -তা থেকে তারা অবস্থান নেয় বহু দূরে ।

খ. সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ

সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ ও সতর্ক করা ধর্মের মূল বিষয়সমূহের একটি। এটি অত্যন্ত মহৎ কাজ যা পালন করার উদ্দেশেই প্রেরণ ঘটেছে নবী রাসূলদের। এটা কল্যাণমুখী জীবনের নিরাপদ ঢাকনা,পরকালে ব্যক্তির পরিত্রাণের পথ। এর দ্বারা লাভ হয় মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা। যা ছেড়ে দিলে সজীবতা হারায় ধর্মকর্ম, ছড়িয়ে যায় মূর্খতা, ব্যাপকতা পায় গোমরাহী।[৩০৬]

যে ক্ষমতা রাখে তারই এ-কাজটি করা উচিত যদিও মনে হতে লাগে যে এ কাজে লাভ হচ্ছে থোরাই। কেননা দাঈর কাজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। মানুষেরা গ্রহণ করছে কি করছে না সেটা তার মূল গুরুত্বের বিষয় নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন :

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

"রাসূলের দায়িত্ব কেবল পোঁছিয়ে দেয়া।"[৩০৭] তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে পথ দেখাতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন পথ দেখান।"[৩০৮] তিনি আরো বলেন :

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

" আপনি সৎকাজের নির্দেশ দিন।"[৩০৯] সাথে সাথে আল্লাহ পাক এজাতীয় বিশেষণেই তাঁকে বিশেষিত করেছেন, এরশাদ হয়েছে :

مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা আছে তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবেন ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবেন।"[৩১০]

রাসূলুল্লাহ ﷺএর জীবন নিয়ে ভেবে দেখলে স্পষ্টভাবে মূর্ত হবে যে তিনি যা কিছু ভালো তার বর্ণনাতেই সারাটি জীবন কাটিয়েছেন। যা পরিত্রাণ দেয় সে-ব্যাপারে উৎসাহ দিতে, অসত্যকে উন্মোচিত করতে, যা কিছু অন্যায়ের দিকে ঠেলে দেয় তা থেকে হুঁশিয়ার করতেই কেটেছে তাঁর গোটা জীবন। হজ্ব-মৌসুমে তাঁর অবস্থা, এর থেকে ভিন্ন ছিল না। কীভাবে হজ্বকর্ম যথার্থভাবে পালিত হবে সে-বিষয়ে তিনি হাজীদেরকে দিয়েছেন সকলপ্রকার দিকনির্দেশনা। তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব বিষয়েই তাদেরকে বলেছেন । যা কিছু অকল্যাণকর তা থেকে সতর্ক করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের উজ্জ্বলতম কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত:,' রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন: আমি শুবরামার পক্ষ থেকে হজ্বের নিয়ত করলাম, তিনি বললেন শুবরামা কে? বললেন : আমার এক ভাই, অথবা নিকট-আত্মীয়। তিনি বললেন : নিজের হজ্ব করেছ? বললেন: না, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রথমে নিজের হজ্ব করো পরে শুবরামার হজ্ব ।[৩১১]

সাহাবাদের যারা কোরবানির পশু সঙ্গে আনেন নি হালাল হয়ে যাওয়ার অনুমতির পর তাদের মধ্যে যারা দেরি করলেন তাদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহﷺ এর অস্বীকৃতি এবং রাগও এ পর্যায়ের একটি বিষয়। অতঃপর তিনি তাদেরকে এই বলে নির্দেশ দিলেন " হালাল হও!" ; তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশে সাড়া দিলেন ও আনুগত্য স্বীকার করে হালাল হয়ে গেলেন।[৩১২]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র কাবা তোওয়াফের সময় এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন যে তার হাত অন্য ব্যক্তির সাথে সূতো অথবা অন্য কিছু দিয়ে বেঁধে রেখেছে , তিনি তা কেটে দিলেন এবং বললেন, হাত দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাও।"[৩১৩]

ফযল ইবনে আব্বাস (রা) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে বারণ করলেন যিনি পাশ দিয়ে যাওয়া নারীদের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন : হযরত জাবেরের (রা) হাদীসে এসেছে : " ফযল ইবনে আব্বাস (রা) কে তিনি সহ-আরোহী করে নিলেন যিনি

ছিলেন দৃষ্টিনন্দন-কেশী, শুভ্র ও সুদর্শন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এগিয়ে চললেন য়াজরিনের মহিলারা পাশ দিয়ে গেলো, ফযল ইবনে আব্বাস তাদের প্রতি তাকাতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র হাত ফযলের (রা) চেহারার ওপর রাখলেন, ফযল (রা) পার্শ্ব বদলিয়ে দেখতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর হাত সেদিকে ফিরালেন ফযলের (রা) চেহারা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য।"[৩১৪]
খাসআমিয়া গোত্রের মহিলার প্রতি যখন তাকালেন তখনো তিনি ফযল (রা) কে বারণ করলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : " ফযল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সহ-আরোহী ছিলেন, খাসআমের এক মহিলা এলো, ফযল তার দিকে তাকাতে লাগলেন, সেও ফযলের (রা) দিকে তাকাতে লাগল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চেহারাকে অন্যদিকে ফিরাতে লাগলেন...।"[৩১৫]
বর্তমান যুগে হাজ্বীদের মাঝে শরীয়তগর্হিত কাজ অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে ছড়িয়ে আছে। দুষ্কর্ম বাসা বেঁধেছে সু-বিস্তর পরিসরে। আর এর অধিকাংশেরই উৎস হলো অজ্ঞতা ও জ্ঞানের স্বল্পতা। দুষ্ট মনোবৃত্তি, কুটিল মানসিকতা এর উৎস নয় বলেই বিশ্বাস। তাই এ প্রকৃতির মানুষকে হেকমত ও নরমপদ্ধতিতে আহ্বান করবেন, দিনের হুকুম আহকাম শিখাবেন, এহসান ও কোমলতাসহ তাদেরকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন, সুকৌশলে ভালো কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করবে , এবং মমত্বপূর্ণ ভাষায় অসত্য ও অকল্যাণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হবে।

ওলামা ও ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে যতই উল্লেখযোগ্য হোক না কেন প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। কেননা মুনকার ও অবৈধ কর্ম এতই ব্যাপকতা পেয়েছে যে খণ্ডিত চেষ্টায় তা রহিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আসলে এ-কাজটি প্রতিটি হজ্বকারী ব্যক্তিরই করা উচিত। যখনই কেউ কাউকে অবশ্যকরণীয় কাজ ছেড়ে দিতে, অথবা কোনো হারাম কাজ করতে দেখবে সাথে সাথে তা প্রতিরোধ করতে উদ্যোগ নেবে; কেননা রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি কোনো অবৈধ কর্ম দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়। যদি না পারে তাহলে জিহ্বা দিয়ে, যদি তাও না পারে তাহলে হৃদয় দিয়ে, আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।" [৩১৬]

আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘিত হলে যারা উত্তপ্ত হয়, সত্য ও ন্যায় প্রচারের দায়িত্ব পালনে যারা সচেষ্ট হয় আপনিও তাদের দলভুক্ত হন। কেননা যে ইসলামে একটি ভালো নিয়ম চালু করল সে তাদের আমলেরও ছোঁয়াব পেলো যারা তার কথামতো কাজ করল। অথচ তাদের নিজেদের ছোঁয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো খারাপ নিয়ম চালু করল সে তার পাপ বহন করল এবং যারা সে অনুসারে আমল করল তাদের পাপের বোঝাও বহন করল, আর তাদের পাপ কোনো অংশেই কমানো হবে না। [৩১৭]

গ.রাসূলুল্লাহর নম্রতা

তাওয়াযু ও নম্রতা নিঃসন্দেহে একটি সেরা চরিত্রগুণ, মহত্ত্বের শিকারযন্ত্র, আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা বেড়ে যাওয়ার কারণ। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলো আল্লাহ তাকে মর্যাদাপূর্ণ করলেন।"[৩১৮] আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"আর যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি বিনয়ী হন।"[৩১৯] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ মানলেন ও এমন পর্যায়ে পৌঁছোলেন যে কেউ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। তিনি নিজেই নিজের সেবা করতেন, বাড়িতে তিনি তাঁর পরিজনের সেবায় নিয়োজিত হতেন, জুতো ঠিক করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন, নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী বহন করতেন, বাচ্চাদেরকে ছালাম দিতেন ও তাদেরকে আদর করতেন, তাঁর সঙ্গীদের থেকে বেশভূষা থেকে শুরু করে কোনো কিছুতেই স্বতন্ত্র হতেন না। যে কোনো মানুষের ডাকে তিনি সাড়া দিতেন হোক সে শ্বেতাঙ্গ অথবা লাল বর্ণের। তিনি বলতেন : "আমি আহার করি যেভাবে কৃতদাস আহার করে, আমি বসি যেভাবে কৃতদাস বসে।"[৩২০] অন্যদিকে তিনি প্রচণ্ডভাবে নিষেধ করেছেন তাঁকে যেন অতিরঞ্জিত আকারে প্রশংসা না করা হয়, প্রতিপালক তাঁর যে অবস্থান নির্ধারিত করেছেন তা থেকে ঊর্ধ্বে উঠানো না হয়। হাদীসে এসেছে : আমাকে

অতিরঞ্জিত করে প্রশংসা করো না যেমন করেছে নাসারারা ইসা ইবনে মারয়াম ﷺএর ক্ষেত্রে। আমি তো নিছক তার দাস অতঃপর বলো আল্লাহর দাস ও রাসূল।" [৩২১]

হজ্বে মানুষদের পরিচালনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর তাওয়াজু ও নম্রতার বহু উদাহরণ রয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নীচের কয়টি:

* জীর্ণ গদি ও চার দিরহাম মূল্যেরও হবে না এমন চাদরে হজ্ব সম্পাদন। [৩২২]

* সর্বসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র অবস্থান অবলম্বন করতে অস্বীকার করা রাসূলুল্লাহর বিনম্র আচরণের একটি বিমূর্ত উদাহরণ। এর বড়ো প্রমাণ- যে পানিতে হাত লাগেনি, ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় সে ধরনের পানি পান করানোর প্রস্তাব দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, " ওটার কোনো প্রয়োজন নেই, মানুষ যেখান থেকে পান করছে সেখান থেকে আমাকে পান করাও।"[৩২৩]

* উসামা ইবনে যায়েদ (রা) কে আরাফা থেকে মুজদালিফা পর্যন্ত সহ-আরোহী করে নেয়া যদিও তিনি মাওয়ালীদের মধ্যে একজন ছিলেন[৩২৪] ।

সবাইকে তাঁর কাছে আসতে দেয়া এবং কাউকে বঞ্চিত না করা। আর রাসূলুল্লাহ ﷺএর তো কোনো দারোয়ান ছিল না যারা মানুষকে ফিরিয়ে দিবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে ও কথা বলতে নিষেধ করবে ।[৩২৫]

* শুধু মাত্র একজন মহিলার কথা শুনতে দাঁড়িয়ে যাওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিনম্র আচরণেরই অকাট প্রমাণ।

* কোরবানি জবাই করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বড়োত্ব না দেখানো বরং এক্ষেত্রে অন্যদের প্রতিনিধিত্ব বৈধ হওয়া সত্ত্বেও , নিজ হাতে ৬৩টি কোরবানি জবাই করা। নিঃসন্দেহে নম্রতার এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই তাওয়াজু ও নম্রতা দিয়ে মানুষের হৃদয় কেড়েছেন, ভক্তির পাত্র হয়েছেন, তাদের ভালোবাসা পেয়েছেন। তাই যারা হজ্বে দাওয়াতি

কাজে জড়িত রয়েছেন, তাদের উচিত এই সর্বোত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করা যাতে তারা মানুষের সাথে আরো বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিতে পারেন; বিশেষ করে যারা দুর্বল ও প্রয়োজনগ্রস্ত তাদের ও যারা দুনিয়ার ধনসম্পদের আপনার থেকে নীচে তাদের সাথে। ইবনুল মুবারক বলেছেন : "বড়ো তাওয়াজু হলো আপনি নিজেকে এমন ব্যক্তির পর্যায়ে নিয়ে রাখবেন দুনিয়ার ধনসম্পদ আপনার থেকে যার কম, যাতে সে আঁচ করতে পারে ধনরত্নের কারণে আপনি তার থেকে উত্তম নন ।"[৩২৬] সাথে সাথে এই তাওয়াজু ও নম্রতা হাজীদের ভালোবাসা লাভের ও তাদের কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার একটি প্রবেশদ্বার। এ বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমেই তাদেরকে পরিণত করতে পারেন উত্তম শ্রোতায়।

ঘ. মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহর দয়া ও করুণা

ইসলাম দয়া ও করুণার ধর্ম। এ ধর্মের শরীয়ত পুরোটাই-মূল ও শাখা উভয় ক্ষেত্রেই- স্নেহ-মায়া-মমতা ও করুণার ওপর দাঁড়িয়ে। এ-কারণে এটাই স্বাভাবিক যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলই রহমতস্বরূপ প্রেরিত হবেন। এরশাদ হয়েছে

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে কেবলই রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৩২৭] রাসূল ﷺ নিজেও তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :" আমি তো নিছক রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।"[৩২৮] তিনি আরো বলেছেন :" আমি মুহাম্মদ,... আমি তাওবা ও রহমতের নবী।"[৩২৯] তাই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সাথে - প্রতিপালক তাঁর সম্পর্কে যেমন বলেছেন " দয়াময় করুণাশীল।" [৩৩০]- সে রকমই আচরণ করেছেন। আর এভাবেই তাঁর রহমত পেয়েছে ব্যাপকতা,দয়া পেয়েছে বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি পেয়েছে মায়ামমতা সকল কিছুতে। তাই মানুষের প্রতি দয়ায় তিনি সর্বোত্তম বলে ভূষিত হলেন। বরং তাঁর ব্যাপারে এরূপ সাক্ষীও এসেছে যে - মানুষ তার নিজের ওপর যতটুকু দয়াশীল তিনি তাদের ওপর তার থেকেও বেশি দয়াশীল। যেমন উমায়মা (রা) এর হাদীসে এসেছে, আমি কিছু মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহর কাছে বাইয়াত নিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন : তোমরা যতটুকু পার ও ক্ষমতা রাখ । আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের থেকেও বেশি দয়াময়"।[৩৩১] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়াময় ছিলেন "। [৩৩২] আর এক ব্যক্তি বললেন : " পরিবার পরিজনের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক দয়াবান আর কাউকে দেখিনি।" [৩৩৩] অন্য এক বর্ণনায় 'বান্দাদের প্রতি'[৩৩৪] শব্দ এসেছে। এ-সর্বব্যাপী দয়ার ফলেই মানুষ তাঁর ভালোবাসায় আত্মোৎসর্গ করেছে, তাঁর আনুগত্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অন্য পক্ষে মানুষকেও নির্দেশনা দেয়া তার পক্ষে সহজ হয়েছে, তাদেরকে পরিচালনা হয়েছে অকঠিন। হজ্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ দয়া ও করুণার বহু উদাহরণ দেখতে পাই। যেমন :

- যারা সঙ্গে করে কোরবানীর পশু আনেন নি তাদেরকে ইহরাম থেকে পুরোপুরি হালাল হতে বাধ্য করা, যার মধ্যে স্ত্রীদের সংশ্রবে যাওয়া, স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার শামিল রয়েছে। এটা মানুষের প্রতি করুণা-বসতই তিনি করেছেন।

- আরাফায় জোহর ও আসর একসাথে জমা করা, মুযদালিফায় যাওয়ার সময় মাগরিব দেরি করে পড়া যাতে বার বার যাত্রাবিরতির ফলে মানুষের কষ্ট না হয়, এবং হাজ্বী তার উট ও আসবাবপত্র ঠিক ওই জায়গায় রাখতে পারে যেখানে সে রাত্রি যাপন করবে।

- রাতের বেলায় চাঁদ ডুবে গেলে মানুষদের পূর্বেই মুযদালিফা থেকে দুর্বলদেরকে প্রস্থানের অনুমতি দেয়া। যাতে তারা ১০ যিলহজ্বের কাজগুলো অন্যদের আগেই সেরে নিতে পারে।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০ যিলহজের কাজগুলো সহজ করে দিয়েছেন ; এগুলো আগে পিছে হয়ে গেলে কোনো সমস্যা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং যারা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন তাদেরকে বলেছেন, " কোনো সমস্যা নেই। "[৩৩৫]

- প্রয়োজনগ্রস্তদের জন্য তিনি সহজ করে দিয়েছেন, যেমন আব্বাস (রা) কে মিনার রাত্রিগুলো মককায় যাপনের অনুমতি দিয়েছেন হাজ্বীদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে।[৩৩৬] উটের রাখালদেরকেও অনুমতি দিয়েছেন য়াউমুননাহরের পরের দু'দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ যে কোনো একদিন একসাথে করে ফেলার।[৩৩৭]

- হজ্ব যার ওপর ফরজ হয়েছে, যদি নিজে আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে প্রতিনিধি দিয়ে আদায় করাকে তিনি বৈধ করে দিয়েছেন[৩৩৮]

- মানুষের প্রতি সহজ করার উদ্দেশে কখনো তিনি অতি উত্তমটা ছেড়ে দিয়েছেন, যেমন আরোহিত অবস্থায় তোওয়াফ ও সাঈ করা, হজরে আসওয়াদ লাঠি দিয়ে স্পর্শ করা, এবং তা চুমু খাওয়া ও হাত দিয়ে স্পর্শ করা ছেড়ে দেয়া; পক্ষান্তরে তোওয়াফ ও সাঈ'র সময় হেঁটে চলাই উত্তম। তিনি এরূপ এজন্য করেছেন যাতে লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে সরিয়ে না দেয়া হয়, অথবা ভির-মুক্ত করার জন্য তাদের মারধর না করা হয়[৩৩৯]।

- অসুস্থের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া। তাদেরকে দেখতে যাওয়া এবং তাদের জন্য যা সহজ হবে সে-বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া এ পর্যায়েরই উদাহরণ।[৩৪০]

তাই যদি আপনি এই রহমতের মৌসুমে আল্লাহর অনুকম্পা পেতে চান, তাহলে দুর্বলদের প্রতি দয়া দেখান, তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, কারণ "করুণকারীদেরকে আল্লাহ করুণা করেন" আর " যে ব্যক্তি করুণা করে না তার প্রতি করুণা করা হয় না,"[৩৪১] " আল্লাহ রহম করেন না যে মানুষকে রহম করে না," [৩৪২] " বান্দাদের মধ্যে যারা রহমকারী কেবল তাদেরকেই আল্লাহ রহম করেন," [৩৪৩] আর সতর্ক থাকুন, যদি পরিত্রাণ পেতে চান, দয়া রহমত ও করুণা যেন কখনো আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া না হয়,

"যেহেতু রহমত কেবল হতভাগ্য ব্যক্তি হতেই ছিনিয়ে নেয়া হয়" আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ-ধরনের পরিণতি থেকে হিফাযত করুন।

৬. মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এহসান

দুনিয়ার ধনসম্পদ আরাম-আয়েশ ও চাকচিক্যের প্রতি যার হৃদয় নির্মোহ সে মানুষের প্রতি এহসান করতে আদৌ কষ্ট পায় না। আর যখন কোনো ব্যক্তি তার আচরণে এহসানের প্রমাণ দেয়, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব-কলহের, তখন, অবসান ঘটে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। কেননা মানুষের অন্তর্জগৎ এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে এহসানকে সে পছন্দ করে, এহসানকারীর সম্মান শ্রদ্ধা করে, উপকারকারীর সামনে বিনয়াবনত হয়। এই মর্মে পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

" যা অধিক ভালো তা দিয়ে দমন করো , তাহলে তোমার ও যাদের মাঝে শত্রুতা রয়েছে তাদেরকে এ-অবস্থায় পাবে যে তারা যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু । "[৩৪৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনধারা ভেবে দেখলে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে প্রতীয়মান হয় যে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের দুনিয়া-বিমুখতা ও গভীরতম এহসান একত্রে জমা করেছেন। দীর্ঘ তিন মাসের মতো চলে যেতো অথচ তাঁর বাড়িতে আগুন জ্বলতো না। খেজুর ও পানি এ'দুটোই হত এ সময়ে তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভোজ্য। [৩৪৫] তিনি সবার থেকে বেশি দানশীল ছিলেন, [৩৪৬] আর তাঁর দান ছিল ওই ব্যক্তির মতো দারিদ্র্যকে ভয় পাওয়া যার স্বভাববিরুদ্ধ। [৩৪৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : " ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আমার যদি স্বর্ণ হতো তবে আমার আনন্দ এতে হতো যে তিন দিন পর তার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না , কেবল সামান্য অংশ ব্যতীত যা ঋণের জন্য ধরে রাখব। এরকম তিনি এজন্যই করতে পারতেন যেহেতু তার হৃদয় আল্লাহর সাথে বাঁধা; তাঁর সমস্ত ভাবজগৎ জুড়ে রয়েছে আখেরাতের চিন্তা । আর দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি তো একেবারেই ছিলেন নির্মোহ , বিমুখ। এমনকী দুনিয়ার মূল্য তাঁর কাছে মাছির ডানার সমানও ছিল না।

হজ্বে মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এহসান গুণে শেষ করা যাবে না। হজ্বের যেকোনো দিক নিয়ে চিন্তা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এহসান অত্যন্ত মূর্ত হয়ে প্রকাশ পায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো নিম্নরূপ :

- রাসূলুল্লাহর সাথে হজ্বের নিয়ত করে যারা বাড়ি থেকে আসতে দেরি করল তাদের প্রতি এহসান করে রাসূলুল্লাহ যুলহুলাফায় পুরা একটি দিবস অপেক্ষা করলেন ।

- হজ্ব মৌসুমে অধিক পরিমাণে দান খয়রাত করা এহসানের এক উদাহরণ। তিনি তার একশত উটের গোশত সমস্তটাই দান করে দেন এমনকি এর চামড়া

ও গদিসহ সমস্ত কিছু আর তিনি একাধিক জায়গায় সদকার সম্পদও বণ্টন করেন।[৩৪৮]

- মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও তাদের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা। [৩৪৯]

- উসামা ইবনে যায়েদ ও ফযল ইবনে আব্বাস (রা) কে আরাফা মুযদালিফা ও মিনার চলাচলের সময় সহ-আরোহী করে নেওয়াও এহসানের একটি আলামত। [৩৫০]

- খোতবায় দুর্বলদের প্রতি সদাচারের নির্দেশ দেয়া , [৩৫১] ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো, তাদের হজ্ব পালন সহজ করে দেওয়াও এহসানের একটি নিদর্শন।
- উম্মতের নাজাতের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ এবং আল্লাহ যেন তাদেরকে কবুল করেন সে কামনা ব্যক্ত করাতেও রাসূলুল্লাহর এহসানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই জোর দিয়েছেন। আরাফা ও মুযদালিফার দিন তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন ।[৩৫২] আর জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে দোয়া চাইল তিনি তাঁর দোয়া সবার জন্য ব্যাপক করে দিয়ে বললেন:" আল্লাহ তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন।" [৩৫৩] এটিও ব্যাপক এহসানের উদাহরণ।
- এহসানের আরেকটি উদাহরণ বালাগের তথা তিনি যে সত্য পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এ বিষিয়টির পুনরাবৃত্তি ও পরিপূর্ণ স্পষ্টতার ব্যাপারে তাগিদ; যাতে সবাই তাঁর বক্তব্য বুঝে ও অনুধাবন করতে পারে।[৩৫৪]
- ফেতনা ও সন্দেহের জায়গা থেকে তাঁর সাহাবাদেরকে বাঁচানোর আগ্রহ থেকেও এহসান প্রতিভাত হয়। এর প্রমাণ, ফযল ইবনে আব্বাসের (রা) গ্রীবা ঘুরিয়ে দেয়া যখন তিনি খাসআমিয়া মহিলার প্রতি নজর দিচ্ছিলেন। এবং যখন তাঁর চাচা আব্বাস (রা) এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তখন   বললেন : " একটি যুবক যুবতী দেখলাম, তাই তাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ

মনে করলাম না ।"[৩৫৫] মসজিদে খাইফে দু'ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তাঁর কথাও এ পর্যায়ে পড়ে। এ-দুই ব্যক্তি তাদের অবস্থান-স্থলে নামাজ পড়ে মসজিদে খাইফে এসে দেখেন রাসূলুল্লাহﷺ নামাজ পড়ছেন , তারা নামাজে শরিক না হয়ে মসজিদের পিছনে বসে গেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : এরূপ করো না, তোমরা যদি নিজ নিজ অবস্থানস্থলে নামাজ পড়ে থাক আর জামাতের মসজিদে আস তাহলে তাদের সাথে নামাজ পড়ো, আর এটা তোমাদের জন্য নফল হবে।"[৩৫৬]

আপনি যদি আল্লাহর মহব্বত পেতে চান, তার করুণা ও নেয়ামত প্রাপ্তিতে নিজেকে ধন্য করতে চান তাহলে রাসূলﷺএর চরিত্রে চরিত্রবান হন। অতঃপর আপনার আমলকে উত্তম করুন, দুর্বল ও প্রয়োজনগ্রস্তদের প্রতি বদান্য ও সদয় হন, চাই তা জ্ঞান বিতরণ করে হোক অথবা ধনসম্পদ শক্তি ও যাতায়াতের বাহন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে হোক। এরশাদ হয়েছে :

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"তোমরা এহসান করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ এহসানকারীদের পছন্দ করেন।"[৩৫৭] আরো এরশাদ হয়েছে :" এহসানের প্রতিদান কি এহসান ব্যতীত অন্যকিছু হতে পারে।"[৩৫৮] আপনার হজ্ব মাবরুর হজ্ব হোক, আপনার পাপ মোচন হোক, আপনি পেয়ে যান বেহেশতে প্রবেশের অধিকার, এ বিষয়ে লালায়িত হলে দরিদ্রদেরকে খাবার খাওয়ান। সুন্দর চরিত্র শক্তভাবে ধরে রাখুন, কারণ যিনি বলেছেন মাবরুর হজ্বের প্রতিদান বেহেশত ব্যতীত অন্যকিছু নয়, হজ্বের উত্তম কাজ কোনটি এবিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর করে বলেছেন:
" খাবার খাওয়ানো ও সদকা করা"।

চ. হজ্বে মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ধৈর্য

ধৈর্য , যারা আল্লাহকে ভয় করেন তাদের পাথেয়, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির সিংহদার, কল্যাণের এক অমূল্য গুপ্তধন। বিজয় আসে না কিন্তু ধৈর্যের পর। নেতৃত্ব জুটে

না কিন্তু ধৈর্যের শর্তে। কখনো কাউকে পরিচালনা ধৈর্য ব্যতীত সম্ভব নয়। কেননা উত্তেজিত হলে ধৈর্যই ব্যক্তিকে দমন করে, উচ্ছৃঙ্খল হলে লাগাম লাগায়, ভালোবাসাকে ফলপ্রসূ করে, ইচ্ছাশক্তিকে শানিত করে, চিন্তাকে দেয় স্বচ্ছতা। এজন্য একজন মানুষকে সর্বোত্তম যা দেয়া হয় তা হলো এই 'ধৈর্য'। মারফু হাদীসে এসেছে: যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের সুযোগ করে দেন। আর কোনো ব্যক্তিকে ধৈর্যের চেয়ে মহৎ ও উত্তমতম আর কিছু দেয়া হয় নি"।[৩৫৯] জ্ঞানীরা এবিষয়টির ব্যাপারে সজাগ, আর নেতৃত্বদানকারীরাও এ বিষটি রপ্ত করেছেন। ফারুকে আযম বলছেন : " ধৈর্য দিয়েই আমরা উত্তম জীবনযাপনে সমর্থ হয়েছি।" [৩৬০] আর আলী (রা) বলছেন :" ধৈর্য এমন এক বাহন যা কখনো হোঁচট খায় না।"[৩৬১]

রাসূল্লাহ ﷺ এর ধৈর্য ছিল একমাত্র আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আনুগত্যের বিষয়ে নিজেকে বাধ্য করে, এবং আল্লাহর ফয়সালার আওতায় নিজেকে ধরে রেখে তিনি এ-ধৈর্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। আর হজ্বে - যা একপ্রকার জিহাদ[৩৬২]- তিনপ্রকার ধৈর্যকেই একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। কেননা তিনি তার সাথিদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, সমধিক আনুগত্যকারী ও আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নকারী ছিলেন। ইবাদত চর্চাতেও তিনি সবার থেকে বেশি ধৈর্যধারণের পরিচয় দিয়েছেন। আর এভাবে তিনি সকল পুণ্যকর্মই প্রতিপালকের সামনে বিনয় নম্রতা ইখ্‌বাত প্রশান্ত হৃদয় ও মিনতির সাথে পালন করতেন। [৩৬৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছিলেন আল্লাহভীরুতায় সর্বোধ্বে, আল্লাহ সম্পর্কে গভীরতম জ্ঞানের অধিকারী, আল্লাহর ইস্যুতে সবচেয়ে বেশি রাগকারী, আল্লাহর সীমানার অতন্দ্র রক্ষী ও আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমানা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থানকারী।

উত্তেজিত না হয়ে অথবা বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে অক্লান্তভাবে তিটি এঁটে থেকেছেন নিজ দায়িত্বে । জনতাকে পরিচালনার কষ্ট-ক্লেশ তিনি সহ্য করেছেন অসম্ভব ধৈর্য নিয়ে। হজ্বে রাসূলুল্লাহর অচ্ছেদ্য কর্মতৎপরতা-

উদ্যম- ধৈর্য তাঁর অবস্থা ও যারা তাঁর সাথে ছিলেন তাদের অবস্থা থেকে সম্যক আঁচ করা যায়।

হজ্বে রাসূলুল্লহ ﷺ এর অবস্থা ও দায়দায়িত্ব পালনের আকার-প্রকৃতির প্রতি নজর দিলে বলা যায় যে তিনি ছিলেন সর্বার্থে আল্লাহর দাস। বিনয় ও নম্রতার পূর্ণতা অর্জনে সর্বোচ্চ শিখরের অশ্বারোহী। হজ্ব পালনে যখন যেভাবে যা করা উচিত ঠিক সেভাবেই অনুপূঙ্খভাবে তা পালনকারী। তিনি মানুষদের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন, হাজ্বীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখেছেন। তাদের অবস্থা বিষয়ে দায়িত্বশীল ও তাদের ঐক্য ধরে রাখার প্রতি যত্নবান ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মুয়াল্লিম ও মুরশিদ ছিলেন। যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর সে বিষয়ে তিনি ছিলেন দীক্ষাদাতা। তিনি সারাক্ষণ যে বিষয়টি নিয়ে ভাবতেন তা হলো রিসালাত পোঁছিয়ে দেয়া ও ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ খুলেখুলে মানুষদেরকে বলে দেয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের জন্য ছিলেন আদর্শ, তাদের দৃষ্টির ছিলেন মধ্যমণি। তাঁরই কথা ও কর্মের প্রতি ছিল সবার আগ্রহ; যাতে তারাও সে-মতে কর্ম সম্পাদন করতে পারে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে পারে।

উপরন্তু খোদ হজ্বকর্ম পালনে যে শ্রম দিতে হয় তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে সেকালে, যখন বর্তমান যুগের মতো যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার আয়েশি ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ পরিমাণও কল্পনা করা যেতো না। বিশেষ করে তিনি যখন হজ্ব করেন তাঁর বয়স হয়েছিল ষাটোর্ধ্ব আর সাথে ছিল নয় উম্মহাতুল মুমিনিন বা রাসূলুল্লাহর পবিত্র স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজনদের দুর্বল লোকেরা। আর এঁদের সবার দেখাশোনার দায়দায়িত্বও ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওপর আরোপিত।

যাদেরকে নিয়ে তিনি হজ্ব করেছেন তাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সংখ্যায় তারা ছিলেন অনেক। এঁদের কেউ পুরাতন মুসলমান আবার কেও নতুন, ধর্ম বিষয়ে কারো জ্ঞান গভীর, কারো ভাসাভাসা। এজাতীয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি অঞ্চল গোত্র বয়স আর্থসামাজিক অবস্থান এবং এর ফলশ্রুতিতে বুদ্ধি

অনুভূতি মেজাজ ভাষা ইত্যাদির পার্থক্যের বিষয়টি তো আছেই। আর শিশু ও দুর্বল মহিলারা যে সেবাযত্নের দাবি করে তার উল্লেখ না হয় বাদই দিলাম।

এসব বিষয় মাথায় রেখে যদি ভেবে দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ কী পরিমাণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেছেন তাহলে আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

তাই আপনিও ধৈর্য ধরুন যেভাবে ধরেছেন রাসূল ﷺ ; কেননা"ধৈর্য ও ক্ষমার নামই ঈমান, "[৩৬৪] আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপে উল্লেখ হয়েছে। ধৈর্যশীলের ছোঁয়াব কি পরিমাণে দেয়া হবে তার একমাত্র হিসাব আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জানা নেই। তাই রাসূলের ধৈর্য আপনার মাইলফলকে পরিণত করুন যার দিকনির্দেশনায় আপনার হজ্বকর্মসমূহ সম্পাদন করবেন ধারাবাহিকভাবে। রাসূলুল্লাহর আনুগত্যে কখনো যেন ছন্দপতন না ঘটে কঠিনভাবে সে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। গোনাহের কাজ থেকে সতর্ক থাকুন, কখনো যেন পা ফসকে গোনাহের নর্দমায় পড়ে না যান সে ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকুন। কষ্ট সহ্য করুন, অস্থিরতা কৈফিয়ত ও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উত্তেজনা প্রদর্শন থেকে বেচে থাকুন। মানুষের স্পর্শে নিজেকে নিয়ে যান। মিশুন। তাদের দেয়া যাতনা সহ্য করুন। কেননা "যে মুমিনব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে ও তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সে ওই ব্যক্তির থেকে উত্তম যে এরূপ করে না, ও ধৈর্য ধারণ করে না।"[৩৬৫] বিষণ্ন চেহারা , কুঞ্চিত ললাট মানুষকে দেখাবেন না; কেননা তা ধৈর্যের বিপরীত অবস্থারই পরিচায়ক।

ছ. মানুষের সাথে কোমল আচরণ

কোমল আচরণের গুরুত্ব বর্ণনায় ও মানুষকে এ-ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর বহু বিভিন্ন বাণী রয়েছে, যেমন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :" আল্লাহ সকল বিষয়ে কোমলতা-নরমপন্থা পছন্দ করেন"[৩৬৬] "কোনো বিষয়ে কোমলতার উপস্থিতি তার ওজনকে বাড়িয়ে দেয়, আর কোনো জিনিসে কোমলতার অনুপস্থিতি তার ত্রুটিপূর্ণ হয়ারই আলামত।

আর যে ব্যক্তি নরমপন্থা থেকে বঞ্চিত হলো সে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেননা কোমলতাই প্রজ্ঞার উৎস, জ্ঞানের সৌন্দর্য, বোধগম্যতার শিরোনাম। সচ্চরিত্র ও প্রবৃত্তিকে লালসা রাগ-রোষ থেকে নিয়ন্ত্রণ, কুড়িয়ে আনে মানুষের ভালোবাসা, হিংসা দ্বেষ দূর করে পরস্পরের সম্পর্ককে করে মজবুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোমল আচরণের অধিকারী ছিলেন বর্ণনাতীতভাবে। তিনি ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমাশীল, দয়ালু। পবিত্র কোরআনে রাসূলুল্লাহর রহমত, করুণা ও বিনম্র স্বভাবের উল্লেখ করে বলা হয়েছে,- আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ। রূঢ় ও কঠিনচিত্ত হলে সরে পড়তো তারা তোমার আশপাশ থেকে। অতঃপর তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের পাপ মোচনের প্রার্থনা করো, কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।'[৩৬৭]

- রাসূলুল্লাহ ﷺ তালবিয়ায় যে শব্দমালা ব্যবহার করেছেন সেগুলোতে বাড়ানো-কমানোর অনুমতি দেয়া নরমপন্থা অবলম্বনেরই একটি নিদর্শন।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রোদ থেকে ছায়া গ্রহণ। হজ্বে আসার পথে, ও পবিত্রস্থানসমূহে গমনাগমনের সময় আরোহণের জন্তু ব্যবহার। কিছু হজ্বকর্ম আরোহিত অবস্থায় পালনও কোমলতা প্রদর্শনের একটি আলামত, কেননা এর অন্যথা হলে মানুষ কষ্ট পেতো; রাসূলুল্লাহকে ভির-মুক্ত করার জন্য হয়তো মানুষদেরকে তাড়ানো হতো অথবা মারধর করা হতো[৩৬৮]।

- মানুষের সাথে কোমল আচরণের আরেকটি উদাহরণ গোটা হজ্বমৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৃশ্যমান আকারে থাকা। কেননা স্বভাবতই মানুষেরা তাদের সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসবে এবং সমাধান তলব করবে।

- সহজকরণ এবং এমন কোনো কিছুর নির্দেশ না দেয়া যা মানুষের সাধ্যাতীত হবে। চাই তা হজ্বের কর্মাদী সম্পর্কে হোক অথবা মানুষদের নেতৃত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাতে চিন্তা করে দেখলে এ-বিষয়গুলো অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হয়।[৩৬৯]

- সকল হজ্বকৃত্য পালনের ক্ষেত্রে এবং হজ্বের পবিত্রস্থানসমূহের মধ্যে যাতায়াতের সময় ভাব-গাম্ভির্য ও শান্ত-ভাব ধরে রাখা এর একটি উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদেরকেও কোমলতা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন; কেননা এর অন্যথা হলে মানুষের কষ্ট হবে ।[৩৭০]

- আরাফার খোতবা সংক্ষিপ্ত করে দেয়াও মানুষের প্রতি কোমল আচরণের আলামত[৩৭১]।

- তোওয়াফে কুদুমের পর আরাফা থেকে ফিরে আসার আগে বায়তুল্লাহর আর কোনো তোওয়াফ না করা । তাশরিকের দিবসসমূহে স্থির হয়ে অবস্থান, ও সেখান থেকে হারাম শরিফে না যাওয়া বিদায়ি তোওয়াফের পূর্বে। যদিও তোওয়াফের ফযিলত অনেক, নিঃসন্দেহে এটা ছিল মানুষের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। [৩৭২]

- সর্বদা সহজটাকে অবলম্বনও কোমল আচরণের আলামত , যেমন হাজ্বীদের যারা সাথে করে কোরবানির পশু নিয়ে আসেননি তাদেরকে পুরোপুরি হালাল হয়ে যেতে বলা। আর আরাফা ও মুযদালিফায় দুই নামাজ একত্রিত করা ও কসর করে পড়া। [৩৭৩]

-সাহাবাদেরকে যার যার অবস্থানস্থলে কোরবানি করার অনুমতি দেয়াও এ পর্যায়ের একটি উদাহরণ, হযরত জাবের (রা) থেকে মারফু হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, " আমি এখানে কোরবানি করলাম, আর মিনা পুরোটাই কোরবানির জায়গা। অতঃপর তোমাদের যার যার অবস্থানস্থলেই কোরবানি করে।" [৩৭৪] আর মহিলাদেরকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই কঙ্কর নিক্ষেপের অনুমতি দেয়া একই সূত্রে গাঁথা ; কেননা মানুষের প্রচণ্ড ভিরে তাদের নানাবিধ ক্ষতি হওয়ার আশংকা থেকে যায়।[৩৭৫]

মানুষদেরকে হজ্বকর্ম পালনের পর দ্রুত দেশে ফেরার তাগিদও এই পর্যায়ে পড়ে। কেননা সফর হলো একটুকরো আযাব, তাই সাহাবাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তিনি বলেছেন : " যখন তোমাদের কেউ হজ্ব সম্পন্ন করে ফেলে সে যেন তার পরিবার পরিজনের কাছে দ্রুত ফিরে যায়। আর এতেই বেশি ছোঁয়াব[৩৭৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে কোমল হতে

বলেছেন। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার কোরবানির পশু টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর নিজে চলছে হেঁটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আরোহণ করো, লোকটি বললেন, এ-তো কোরবানির পশু ! তিনি বললেন : আরোহণ করো, লোকটি বললেন : এ-তো কোরবানির পশু! তিনি বললেন : আরোহণ করো, কি হলো ? - দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার বললেন-"[৩৭৭] তিনি আরো বলেছেন :" তোমরা সৌজন্যের সাথে কোরবানির পশুতে আরোহণ করো, যতক্ষণ না অন্য বাহন পেয়ে যাও। [৩৭৮] কঙ্কর নিক্ষেপের সময় বলেছেন : হে লোকসকল, তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না, একে অপরকে আঘাত করো না, আর যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করবে আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করার মতো কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।[৩৭৯] তিনি হযরত ওমর (রা) কে বলেছেন হে ওমর! তুমি শক্তিমান মানুষ। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের জন্য ভির ঠেলে যেতে যেও না যা দুর্বলকে কষ্ট দিবে। যদি খালি পাও তবে স্পর্শ করো। অন্যথায় এর দিকে মুখ করো , তাকবির দাও ও তাহলিল পড়ো।[৩৮০]

-সাহাবাদের ইচ্ছার বিপরীতে কিছু ঘটলে তাদেরকে বুঝানো ও সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা এ পর্যায়েরই ঘটনা। এই সূত্রেই তিনি বলেছেন : যদি আমি পেছনের দিনগুলো সামনে পেতাম কোরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না, যদি কোরবানির পশু আমার সঙ্গে না থাকতো তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।"[৩৮১] অর্থাৎ যদি আমি জানতাম একাজটি তোমাদের জন্য কঠিন হবে তাহলে কোরবানির পশু সঙ্গে আনা ছেড়ে দিতাম এবং তোমরা যেভাবে ইহরাম ছেড়ে দিচ্ছ আমিও সেভাবে ছেড়ে দিতাম। [৩৮২] সা'ব ইবনে জুছামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে গাধার পশ্চাদ্‌ভাগের গোশত হাদিয়া হিসেবে খেতে দিলে ফেরত দিলেন এবং বললেন :" আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, অন্যথায় ফিরিয়ে দিতাম না" [৩৮৩] হযরত আবু কাতাদাহর (রা) সাথিদেরকে বললেন যখন তিনি শিকার করলেন, আর তার সাথিরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায় , কিন্তু তিনি ছিলেন হালাল। তিনি শিকার করেছিলেন তাদের কোন ইঙ্গিত বা সাহায্য ব্যতীতই, অতঃপর তারা বিষয়টি নিয়ে সন্দেহে পড়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি

কেউ নির্দেশ দিয়েছে? অথবা ইশারা করেছে? তারা বললেন, না । তিনি বললেন : তাহলে অবশিষ্ট গোশত খেয়ে ফেলো" অন্য এক বর্ণনায় : তিনি বললেন, তোমাদের সাথে এর কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে ? তারা বললেন : পায়ের অংশ। তিনি তা নিলেন ও খেলেন।"[৩৮৪]

বর্তমান যুগের হাজীদের মাঝে হজ্বসংক্রান্ত অজ্ঞানতা খুবই প্রকট। দুর্বল ও বয়োবৃদ্ধদের সংখ্যাও প্রচুর যারা কোমল আচরণের মুখাপেক্ষী সকল বিষয়ে। পরিচালনা, তালীম তারবিয়ত, নসীহত ও দিকনির্দেশনা, এমনকী সেবা ও এহসান সকল বিষয়েই তারা সদাচারের দাবি রাখে।

তাদের সাথে সুন্দর কথা বলুন। বিনয় ও নম্রতার আদর্শ স্থাপন করুন। আপনার সকল আচরণে কোমল হন। তাদের পক্ষে যা সহজ তা পছন্দ করুন। রাগ-রোষের স্পর্শ অনুভব করলে নিজেকে কন্ট্রোল করুন। সহিংস আচরণ বর্জন করুন। অশালীন ভাব ও ভাষা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন, কেননা তা সদয় ও আলোকিত আদর্শের পরিপন্থী। হাদীসে এসেছে : " যাকে কোমল আচরণের একটি অংশ দেয়া হলো, তাকে কল্যাণের একটি অংশ দেয়া হলো। আর যার কোমল আচরণে অংশ নেই সে কল্যাণের অংশ থেকেও বঞ্চিত।

জ. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্বদান বিষয়ে আরো কিছু কথা

রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বে অনেক কিছুই করেছেন যা তার নেতৃত্ব প্রদান প্রক্রিয়াকে সফল করতে, মানুষের সাথে সদাচার করতে ও তাদেরকে প্রভাবিত করতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এ পর্যায়ের দৃশ্যমান কয়টি হলো:

মানুষদের সুশৃঙ্খল করণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদেরকে মিনায় সুশৃঙ্খল করেছেন। আর প্রতি ব্যক্তিকেই তার প্রাপ্য মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: " রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন, তিনি সবাইকে যার যার প্রাপ্য মর্যাদার আসনে বসান। 'মুহাজিরগণ এখানে অবস্থান করবে' কেবলার ডানে অবস্থিত এলাকার দিকে

ইঙ্গিত করে তিনি বললেন। 'আনসারগণ এখানে' - কেবলার বামে অবস্থিতি এলাকার দিকে ইঙ্গিত কেরে বললেন। আর অন্যান্যরা তাদের পিছনে অবস্থান করবে। [৩৮৫] অন্য এক বর্ণনানুসারে :" তিনি মুহাজিরদেরকে নির্দেশ দিলেন মসজিদের সম্মুখভাগে অবস্থান করতে। আনসারদেরকে মসজিদের পিছনে এবং অন্যান্য মানুষদেরকে তাদের পিছনে অবস্থান করতে বললেন।[৩৮৬]

বর্তমান যুগে হাজ্বীদের মাঝে সৃষ্ট অধিকাংশ সমস্যার কারণ এক দল মানুষের তাদের নিজস্ব স্বার্থকে অন্য দলের ওপর প্রাধান্য দেয়া। আর আইন শৃঙ্খলা যা মানা উচিত তা অমান্য করা। তাই কতই না প্রয়োজন আপনি মানুষকে সুন্দর নমুনা উপহার দিবেন। নিজের ইচ্ছাসমূহ পিছিয়ে দিবেন, এবং আপনার ভাইয়ের কল্যাণে নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিবেন।

মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে উৎসাহ দেয়া

মানুষের সেবায় নিয়োজিত লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়াকেও সহজ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (রা) কে মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের অনুমতি দিলেন। কেননা তিনি মানুষদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৩৮৭] শুধু তাই নয় বরং তিনি এ কাজে নিয়োজিতদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:"তোমরা কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই তোমরা উত্তম কাজে নিয়োজিত রয়েছ ...।" [৩৮৮]

এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর বিশেষ করুণা যে বর্তমান যুগে অনেক স্বেচ্ছাসেবীই মানুষের কল্যাণার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ব্যয় করে যাচ্ছে তাদের মূল্যবান সময়। তবে অধিকাংশ, ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার সামান্য হাসি থেকেও বঞ্চিত হয় তারা, বরং অনেক সময় ভর্ৎসনা ও নির্যাতনকে নীরবে সহ্য করে যেতে হয় তাদের। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাওয়া তো বহুদূরে। তাই কতইনা উত্তম হবে মানুষকে এ-ব্যাপারে উৎসাহিত করা, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :" যারা মানুষের ব্যাপারে কৃতজ্ঞ নয়, তারা আল্লাহর ব্যাপারেও অকৃতজ্ঞ"।[৩৮৯] এই মহৎ ও কল্যাণকামী লোকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের উৎসাহ দেয়ার ক্ষেত্রে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করো। যাতে তাঁরা ভালো কাজ চালিয়ে যেতে প্রেরণা পায়, পূর্বের চেয়ে বেশি উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যেতে প্রদীপ্ত হয়।

মানুষের অধিকার বিষয়ে যত্নবান হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের অধিকার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। এর কয়েকটি উদাহরণ নিরূপ:

আয়েশা (রা) যখন মিনায় রাসূলুল্লাহর জন্য ঘর উঠাতে চাইলেন যার ছায়তলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় নিবেন, তিনি বললেন: মিনা তো হলো পূর্বে আসা লোকদের অবস্থানের জায়গা।"[৩৯০] যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিতদের সাহায্য থেকে বিরত থেকেছেন কেননা মানুষ তাদেরকে পরাভূত করে রাসূলুল্লাহর কাছে ভির করবে, তিনি বলেন:" মানুষ তোমাদেরকে পরাভূত করবে এই ভয় না হলে আমি নেমে যেতাম এবং এখানে রশি রাখতাম, অর্থাৎ গ্রীবায়।"[৩৯১]

আজ দেখা যাচ্ছে অনেক হাজ্বীদের অধিকারই খর্ব হচ্ছে দুনিয়া পূজারীদের হাতে যারা পবিত্র ভূমিতে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। মানুষের অর্থ-কড়ি অবৈধভাবে হাতিয়ে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এ-জাতীয় লোকদের সংস্পর্শ এবং তারা যা করছে তাতে জড়িয়ে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। আর যদি ক্ষমতা রাখেন তাহলে নসীহত উপদেশ দিয়ে তাদের সংশোধন করুন অথবা তাদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করুন।

সত্য প্রকাশে অকুতোভয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমধিক দয়াবান, ও সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তা সত্ত্বেও সত্য প্রকাশে কখনো তিনি ইতস্ততা বা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। যদিও এতে অসুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। সত্য প্রকাশে রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে অনমনীয় অবস্থান হজ্ব পালনের সময় বহু জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- অন্যদের চোখের সামনেই খাসয়ামিয়াহ মহিলার প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে ফযলের (র) গর্দান ঘুরিয়ে দেয়া, এমনকি আব্বাস (রা) প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার চাচাতো ভাইয়ের গর্দান এভাবে ঘুরিয়ে দিলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন : একজন যুবক ও যুবতীকে দেখলাম, শয়তানের আক্রমণ থেকে আমি তাদেরকে নিরাপদ মনে করলাম না। [৩৯২]

- নবীর স্ত্রী সাফিইয়া (রা) যখন ঋতুগ্রস্ত হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ মনে করলেন, তিনি হয়ত ১০ যিলহজ্ব তোওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করেন নি। তাই তিনি বললেন : " মনে হয় এ তোমাদেরকে বিলম্ব করাবে।"[৩৯৩]

- কর্মঠ ও শক্তিমান জনৈক ব্যক্তি সাদকার সম্পদ চাইলে তাকে না দেওয়াও এ পর্যায়ে পড়ে।

- কোরবানির পশু সঙ্গে না আনা সত্ত্বেও ইহরাম ধরে রাখার ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবাদের ইচ্ছার বিপক্ষে রাসূলুল্লাহর অবস্থান এবং বলা যে কোরবানির পশু সঙ্গে না এনে থাকলে আমি হালাল হয়ে যেতাম,"[৩৯৪] সত্য প্রকাশে ঐকান্তিকতারই একটি আলামত।

তাই আপনি সমর্থবান হলে হাজ্বীদের শেখানো, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেয়া, আমর-বিলমারুফ ও নাহি-আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন, সত্যকথা বলা ইত্যাদি বিষয়ে কখনো পিছপা হবেন না। আর লজ্জা করার তো কোনো মানেই হয় না। কারণ আল্লাহ কখনো সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করুন যিনি " লজ্জাবতী কিশোরীর থেকেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন" [৩৯৫] তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর জন্য রাগ করতেন ও প্রতিশোধ নিতেন। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুণ বর্ণনায় বলেন :"আল্লহর রাসূল কোনো জিনিসকেই তাঁর হাত দিয়ে প্রহার করেন নি, না তাঁর কোনো স্ত্রীকে না খাদেমকে, তবে যদি জিহাদরত অবস্থায় থাকতেন, তাঁর কাছ থেকে কেউ কোনো কিছু নিয়ে নিলেও তিনি প্রতিশোধ নিতেন না। তবে আল্লাহর কোনো সীমানা লঙ্ঘিত হলে আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন। [৩৯৬]

ভুলকারীকে ভর্ৎসনা না করা

সাহাবাদের মধ্যে যারা ভুল করতেন তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিন হতেন না। ভুলকারী জাহেল হলে তাকে শেখানোর চেষ্টা করতেন। ভুল সংশোধনের ব্যাপারে যত্ন নিতেন; কে ভুল করল সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিতেন না।" এর প্রমাণ :

জনৈক ব্যক্তি - হালাল হতে তার অনিচ্ছাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ অমার্জিত ভাষায় বলল :" অতঃপর আরাফায় এ অবস্থায় যাব যে আমাদের শিশ্ন বেয়ে রেত টপকাচ্ছে "! কথাটা কে বলল, কী তার পরিচয়? এ সব জানতে তিনি মোটেও আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি, বরং, সাহাবাদের বুঝাতে সচেষ্ট হলেন এবং তাদের পক্ষে যা উত্তম তা করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন :" তোমরা জান যে আমি তোমাদের থেকে বেশি আল্লাহকে ভয় করি, তোমাদের থেকে বেশি সত্যবাদী ও সৎকর্মকারী, কোরবানির পশু সঙ্গে না এনে থাকলে আমি হালাল হয়ে যেতাম যেভাবে তোমরা হালাল হচ্ছ; অতঃপর তোমরা হালাল হয়ে যাও, আমি যদি পেছনের দিনগুলোকে সামনে পেতাম, তাহলে কোরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না।"[৩৯৭]

- খাসআমের যুবতী মহিলার প্রতি তাকানোর অপরাধে ফযল ইবনে আব্বাসকে ভর্ৎসনা না করে ওই দিক থেকে তার চেহারা ঘুরিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া এ পর্যায়েরই একটি উদাহরণ।[৩৯৮]

-যে দু'ব্যক্তি তাদের অবতরণস্থলে নামাজ পড়ে এলো এবং জামাতের সাথে নামাজে শরিক হলো না তাদেরকেও ভর্ৎসনা করলেন না, বরং তাদের সন্দেহ বিমোচনার্থে তাদের অজ্ঞানতা দূর করেই কেবল ক্ষান্ত হলেন, এবং তাদের পক্ষে যা উত্তম তা করতে নির্দেশ করলেন।[৩৯৯]

- যে দু'ব্যক্তি কর্মক্ষম ও শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও সদকার সম্পদের ভাগ চাইল তাদের ধমক না দিয়ে এমনভাবে বুঝিয়ে দেন যে তারা স্বেচ্ছায় নিজ উদ্যোগেই তা বর্জন করে, নিঃসন্দেহে এ ঘটনা আচরণের ক্ষেত্রে মহানুভবতারই পরিচায়ক।

রাসূলুল্লাহর সারল্য

হজ্বে মানুষদের পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূল্লাহﷺ এর সফলতার সবচেয়ে বড়ো কারণ তাঁর স্বাভাবিকতা, সারল্য, ও অনাড়ম্বরতা এবং সকল বিষয়ে স্পষ্টতা। মানুষদের পরিচালনা বিষয়ে রাসূলুল্লাহﷺ এর কর্মধারা নিয়ে ভেবে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে তিনি তাদেরকে যা কিছুর নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্বও ছিল দৃশ্যমান। হজ্বকর্ম ছিল জ্ঞাত। চলার পথও জানা। স্থান ও কাল সুনির্দিষ্ট। এ-কারণেই যাদের তিনি পরিচালনা করেছেন তাদের সামনে সবকিছুই ছিল মূর্ত, তাদের প্রত্যেকেই জানতো কোথায়-কখন কী করণীয়। তাই যদি আপনি হাজ্বীদের কোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল হন তাহলে সবকিছু তাদেরকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলুন। স্পষ্টতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিন। অস্পষ্টতা, অতিরঞ্জন ছেড়ে দিন।

মানুষের প্রতি মমত্ববোধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নম্র বিনয়ী ও কোমল মেজাজের। তিনি সহাস্য ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর থেকে বেশি হাস্যজ্জ্বোল মানুষ আর দেখা যায়নি। যখন তিনি কথা বলতেন মৃদু হাসতেন। সাহাবাদের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারেও তিনি কারপণ্য করতেন না। হজ্বে এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) হাদীস যেখানে এসেছে :“ আমরা বনু আব্দুল মুত্তালিবের শিশুরা উটের ওপর আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলাম তিনি আমাদের রানে মৃদু আঘাত করে বলতে লাগলেন, আমার সন্তানরা! সূর্য ওঠার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করো না।”

তাই হজ্বে আপনি মানুষজনের সাথে সাক্ষাতের সময় সুন্দরভাবে ছালাম-কালাম করুন, উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাদের সংস্পর্শে আসুন। গুছিয়ে মার্জিতভাবে কথা বলুন। কর্মে শালীন হন, তাহলেই গ্রহণযোগ্যতা পাবেন সকলের কাছেই । কুড়িয়ে নিতে সমর্থ হবেন তাদের ভালোবাসা । আর এসবই বয়ে আনবে আপনার জন্য অফুরান ছোঁয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।

গম্ভীর ভাব ও বেশবিন্যাস

তিনি হজ্বে - যেমন হজ্বের বাইরে- দেহ-সৌষ্ঠব, ও বেশভূষার প্রতি যত্নবান ছিলেন ; এমনকী তার চেয়ে সুন্দর আর কাউকে দেখা যায় নি। তিনি তাঁর পবিত্র কেশের যত্ন নিয়েছেন। চুল যাতে উড়ন্ত অবস্থায় না থাকে তার ব্যবস্থা করেছেন। ইহরাম বাঁধা ও হালাল হওয়ার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। ইহরামের পূর্বে গোসল করেছেন । মক্কায় প্রবেশের পূর্বেও গোসল করেছেন।[৪০০]

তিনি গুরুগম্ভীর ও ভারিক্কি ছিলেন। চালচলনে যা অনুচিত তা তিনি কখনো করেন নি।[৪০১] তাইতো তিনি ছিলেন সবার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র । হারেস ইবনে আমর আস্‌সুহামী (রা) এর কথায় এর প্রমাণ মিলে, তিনি বলেন :" মিনা অথবা আরাফায় আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এলাম, মানুষ তাকে ঘিরে আছে : 'বেদুইনরা আসে' -- তিনি বলেন-- এবং তাঁর চেহারার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই বলে ওঠে : 'এটি বরকতময় চেহারা।'[৪০২]

অতঃপর আপনি আপনার বহিরদৃশ্য ও কান্তির ব্যাপারে যত্নবান হোক। লজ্জার আবরণে নিজেকে মুড়িয়ে নিন। গুরুগম্ভীর ভাব বাজায় রাখুন। বেশি হাসি-ঠাট্টা থেকে বিরত থাকুন। এরূপ করাতে মানুষের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে আপনার কথা ও বক্তব্যে মনোযোগ দেয়ার মাত্রাও তাদের বেড়ে যাবে।

হজ্বে মানুষের সাথে আচরণে রাসূলুল্লাহ ﷺএর আদর্শগত পরিপূর্ণতার কিছু উদাহরণ ওপরে উল্লেখিত হলো যা মানুষকে তার কাছে টেনে এনেছে। তাদের হৃদয়রাজ্যে শ্রদ্ধার আসন পাততে সহায়তা করেছে। তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি কুড়িয়ে এনেছে। অতঃপর আপনার উচিত তাঁর আনুগত্যে ঐকান্তিক হওয়া। তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নে সদা প্রস্তুত থাকা।

যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে চান তাদের এই চরিত্র-মাধুরীতে সুসজ্জিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো গত্যন্তর নেই। নবীদের চরিত্রে নিজেদেরকে চরিত্রবান না করলে প্রতিষ্ঠা, গ্রহণযোগ্যতা কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়।

হজ্বে

পরিবার পরিজনদের মাঝে

রাসূলুল্লাহ ﷺ

হজ্বে পরিবার পরিজনদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ

আত্মীয়দের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺএর যত্ন-দয়া-এহসান ছিল অশেষ। যারা তাঁর স্পর্শে এসেছেন সবাই এ সাক্ষী তাদের সবার। রাসূলুল্লা ﷺ এর গুণ বর্ণনাকরীদের কথা অনুযায়ী তিনি " মানুষের মধ্যে সমধিক সদাচারী , সব থেকে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন"।[৪০৩] আত্মীয়- স্বজনকে কল্যাণের পথে আহ্বান, তাদের সত্যপথ প্রাপ্তি ও দোযখ থেকে মুক্তি লাভের প্রত্যাশা আত্মীয়দের প্রতি রাসূলুল্লাহর সীমাহীন দরদকেই নির্দেশ করে। এর একটি উদাহরণ সাফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাঁড়ানো এবং শিরকের পরিণাম থেকে তাঁদেরকে হুঁশিয়ার করা। সাফায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন :" হে ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ, হে সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালেব, হে আব্দুল মুত্তালেবের সন্তানরা! আমি তোমাদের জন্য কোনো কিছুরই মালিক না। আমার সম্পদে যা ইচ্ছা দাবি করো।"[৪০৪] এই সূত্রে তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবকে বললেন :" হে চাচা " বলুন! আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই' , আমি আল্লাহর কাছে এ কালেমাটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করব।"[৪০৫]

হজ্বে স্বজনদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সদাচার ও এহসান, বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ পেয়েছে , তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১.হজ্বের আহকাম শেখানোর ব্যাপারে যত্ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বজনদেরকে হজ্বের আহকাম শেখানোর ব্যাপারে যত্ন নিয়েছেন যাতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাঁরা সঠিক পথে চলতে পারেন, তাদের ইবাদত আরাধনা বিশুদ্ধতা পায়। এর উদাহরণ : হযরত উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : "হে মুহাম্মদের পরিবার! হজ্বে তোমরা ওমরার নিয়ত করো।"[৪০৬] তোওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হযরত আয়েশা ঋতুবতী হলে তাকে তিনি বললেন :" অন্যান্য হাজ্বীদের সাথেই তুমি হজ্বকর্ম চালিয়ে যাও , তবে বায়তুল্লাহর তোওয়াফ করো না।"[৪০৭]

"সূর্যোদয়ের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করো না,[৪০৮] আব্দুল মুত্তালেব পরিবারের শিশুদেরকে রাসূলুল্লাহর একথাও সে পর্যায়ে পড়ে। স্বজনদেরকে সরাসরি

দিকনির্দেশনা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, তিনি তাদের সাথে আলোচনায় বসতেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। হযরত হাফছা (রা) বর্ণনা করেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্নীদেরকে (রা) বিদায় হজ্বের সময় হালাল হয়ে যেতে বললেন : উত্তরে তাঁরা বললেন : তা হলে আপনি হালাল হচ্ছেন না কেন ? তিনি বললেন :" আমি মাথা তালবিদ করেছি, হাদীর জন্তুকে মালা ঝুলিয়েছি। তাই হাদী জবেহ না করা পর্যন্ত হালাল হব না।"[৪০৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : তিনি বললেন : মানুষের কি হলো ? তারা হালাল হয়ে গেলো আর আপনি ওমরা থেকে হালাল হলেন না। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও এই মর্মে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন :" হযরত আব্বাস (রা) বললেন : য়্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার চাচাতো ভাইয়ের গর্দান কেন ঘুরিয়ে দিলেন ? তিনি বললেন : আমি একটি যুবক ও একটি যুবতীকে দেখলাম , অতঃপর শয়তানের আক্রমণ থেকে তাদেরকে নিরাপদ মনে করলাম না।

হজ্বের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্তমান যুগের অনেক হাজ্বীদের কাছেই অজ্ঞাত। হজ্বের আহকাম বিষয়ে মূর্খতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে অনেককেই। কেননা পরিবার পরিজনদেরকে যারা এ-জাতীয় আহকাম শিখায়, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সঠিক ধারণা দেয়, তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়, তাদের সংখ্যা খুবই কম।

তবে যারা এই মুবারক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক। তারাই বরং সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিজনদের কাছে উত্তম। আর আমি এক্ষেত্রে তোমাদের থেকে উত্তম।"[৪১০] পরিজনদের ব্যাপারে যেভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত সেভাবেই দায়িত্ব পালন করুন। কেননা আপনি তাদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে অভিভাবক। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : " তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক আর প্রত্যেককে তার অভিভাবকত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। ... ব্যক্তি তার পরিবারের অভিভাবক , সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৪১১] রাসূলুল্লাহর জীবনে আপনার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, তিনি অন্যদেরকে দোযখের ভয় দেখানোর আগে নিজের স্বজনদের হুঁশিয়ার করেছেন, তাদের শিখিয়েছেন, ও

এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন যেখানে বলা হয়েছে :“ তুমি তোমার স্বগোত্রীয় নিকটজনদেরকে হুঁশিয়ার করো।” [৪১২]

২. হজ্বকর্মে পরিবারের সদস্যদেরকে ব্যস্ত রাখা

হজ্বের পূর্বেই পরিবারের সদস্যদেরকে এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যস্ত রেখেছেন। হযরত আয়েশার হাদীস এদিকেই ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন :“ রাসূলুল্লাহর (স) ইহরামের পূর্বে আমি তাঁর হাদীর জন্য মালা বুনেছি।” [৪১৩]

এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহﷺএর অনুসরণ করা কতই না জরুরি। তাই চলুন হজ্বের পূর্বেই নিজেকে ও যারা সঙ্গে যাবে এমন আত্মীয়স্বজনকে হজ্ব বিষয়ে ব্যস্ত রাখি। নিজের ও পরিজনদের হৃদয় হজ্বের সাথে জুড়ে দিই। এতে হজ্ব পালনের ইচ্ছায় আসবে দৃঢ়তা, বৃদ্ধি পাবে এর হুকুম-আহকাম- ফযিলত-ছোয়াব সম্পর্কে জ্ঞান, শেখা হবে এর নিয়মকানুন। প্রস্তুতিতে সংযোজন হবে নতুন মাত্রা। আর এসব বিষয় একজন ব্যক্তিকে হজ্বে যা কিছু করা উত্তম সে বিষয়ে, ও যেভাবে করা উত্তম সেভাবে আদায় করতে সাহায্য কর।

৩- হজ্ব বিষয়ে পরিবার পরিজনদের দায়িত্ব যাতে যথাযথ পালিত হয় সে বিষয়ে যত্ন

যাদের সামর্থ্য রয়েছে আল্লাহ পাক তাদের ওপর হজ্ব ফরজ করেছেন। তিনি বলেছেন :“ যারা সমর্থবান তাদের ওপর আল্লাহর এই অধিকার যে তারা পবিত্র ঘরের হজ্ব করবে,” [৪১৪] তাই সমর্থবান ব্যক্তি এ-দায়িত্বটি আদায় না করা পর্যন্ত তা ঝুলে থাকে। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺএর সীরাত ঘেঁটে দেখবে পরিজনদের দায়দায়িত্ব পালনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতটুকু যত্নবান ছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাবে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া গেলো :

* সকল স্ত্রীদেরকে (রা) সঙ্গে করে হজ্বে আসা।[৪১৫]
* পরিবারবর্গের যারা দুর্বল তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে হজ্বে আসা।[৪১৬]
* এমনকী তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকেও যথাসম্ভব দ্রুত হজ্ব পালনের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া। এরই একটি উদাহরণ যে তিনি যাবায়া বিনতে

যুবায়েরের কাছে গেলেন, এবং বললেন : - আপনি হজ্বে যাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন :" আমি অসুস্থ আর আমি আশঙ্কা করছি যে বাধার সম্মুখীন হব । তিনি বললেন: ইহরাম বাঁধুন ও শর্ত করে নিন যে, যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবেন সেখানেই আপনার হালাল হওয়ার জায়গা। [৪১৭] অন্য এক বর্ণনায় : তুমি এ-বছর হজ্ব করবে না ?.... ।" [৪১৮]

আজ আমরা দেখছি অনেক বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা অর্থ-কড়ি থাকা সত্ত্বেও হজ্ব পালন করে নি। তাই, যদি আল্লাহ আপনাকে শক্তি দিয়ে থাকেন তাদের প্রতি এহসান করুন। তাদের হাত ধরে হজ্বে নিয়ে যান। আপদবিপদ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পাড়ে। নানা প্রকার সমস্যা প্রাপ্ত সুযোগ ছিনিয়ে নিতে পারে। আর দুনিয়া এক অবস্থায় কারো জন্য স্থির থাকে না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হজ্ব সেরে নিতে বলেছেন। হাদীসে এসেছে : " যে ব্যক্তি হজ্ব সম্পাদনের ইচ্ছা করল সে যেন বিলম্ব না করে। কারণ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, বাহন হারিয়ে যেতে পারে, প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।" [৪১৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : " হজ্ব বিষয়ে তাড়াতাড়ি করো, - অর্থাৎ ফরজ হজ্ব - কেননা তোমাদের কেউ জানে না যে সে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবে।"[৪২০]

এভাবে হাত ধরে পরিবারের সদস্যদেরকে হজ্বে নিয়ে গেলে, তাদেরকে সহায়তা করলে তার ছোওয়াব আপনি অবশ্যই পাবেন। জনৈক মহিলা তার ছোট্ট শিশুকে উঁচু করে ধরে বললেন, এর হজ্ব হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হবে আর আপনি তার ছোওয়াব পাবেন। [৪২১] মনে করিয়ে দেয়া ভালো যে স্ত্রীকে নিয়ে হজ্ব করতে যাওয়া আপনার কর্তব্য, পক্ষান্তরে উল্লেখিত মহিলার তার শিশুকে নিয়ে হজ্ব করা জরুরি ছিল না।

৪- ইবাদত ও আনুগত্য চর্চায় উৎসাহ দান

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ইবাদত ও আনুগত্য যথাযথভাবে পালন করার প্রতি উৎসাহ দিতেন। ভালো ও পুণ্যকীর্তি আহরণের জন্য তিনি তাদের প্রেরণা জোগাতেন। এর একটি উদাহরণ: তিনি যখন তাঁর চাচাতো ভাইদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন -যারা যমযম কূপ থেকে পানি

ওঠাচ্ছিলেন এবং মানুষদেরকে পান করাচ্ছিলেন- তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :" আব্দুল মুত্তালেবের সন্তানরা তোমরা পানি উঠাও! মানুষ তোমাদের ওপর প্রচণ্ড ভির করবে এ-ভয় না হলে আমিও তোমাদের সাথে পানি ওঠাতাম। অন্য এক বর্ণনায় তোমরা কাজ করে যাও, নিশ্চয় তোমরা ভালো কাজ করছ। মানুষেরা প্রচণ্ড ভির করবে এ-ভয় না হলে আমি তোমাদের সাথে পানি ওঠাতাম এবং এখানে - তিনি তাঁর পবিত্র গ্রীবার দিকে ইশারা করলেন- রশি রাখতাম। পানি পান করানোর কাজ যাতে সহজভাবে করা যায় সেজন্য তিনি তাদের সুযোগও করে দিতেন : হযরত আব্বাসকে (রা) তিনি মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের অনুমতি দিলেন হাজ্বীদেরকে পানি পান করানোর প্রয়োজনে।

হজ্ব ,এহসানের এক বড়ো দরজা। পুণ্যকর্মের মৌসুম। দুর্বল অসহায়দের সংখ্যাও সেখানে প্রচুর। তাই যদি আপনি পুণ্যকর্ম বাড়াতে চান, সৎকর্ম দিয়ে আপনার পাল্লা ভারী করতে চান তা হলে হাজ্বীদের প্রতি এহসান করুন। আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে সৎকর্ম বিষয়ে দীক্ষিত করে তুলুন। পুণ্যকীর্তিসমূহ তাদের দেখিয়ে দিন। ভালো কাজ যেন তারা করতে পারে সে জন্য সুযোগ করে দিন। প্রয়োজনগ্রস্তদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে তাদেরকে উৎসাহিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কাউকে কোনো হিদায়েত তথা ভাল কাজের প্রতি ডাকবে, সে অনুসারে আমল করবে তাদের ছোয়াবের মতোই সে ছোয়াব পাবে, অথচ মূল আমলকারীদের ছোয়াবের কোনো অংশই কমবে না [৪২২]। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখায় সে পুণ্যকর্মার তুল্যই ছোয়াব পায়।"[৪২৩] গোমরাহী বা পথ-বিচ্যুত হতে কখনো তাদের উৎসাহ জোগাবেন না, অথবা কোনো পাপ কর্মের উপদেশ তাদেরকে দিবেন না। অথবা কোনো মুনকারের সাথে জড়িত হতে তাদেরকে সহায়তা দিবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমর্মে সতর্ক করে বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর দিকে ডাকে সে পাপকারীদের গোনাহের তুল্য গোনাহের ভাগী হয়। আর এতে তাদের গোনাহের কোনো অংশ কমে না।"[৪২৪]

৫- আত্মীয় পরিজনের সহায়তা গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আলে বাইতের তথা পরিবারের সদস্যদেরকে কোনো কোনো কাজে প্রতিনিধি করেছেন, আবার কিছু কিছু কাজ তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। এর প্রমাণ :

* ইহরাম বাধার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশাকে (রা) হাদীর জন্তুসমূহের কিলাদা (মালা) পশম দিয়ে বুনোনোর নির্দেশ দিলেন ।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাবার দিন সকালে বললেন : আমার জন্য কঙ্কর কুড়াও , অতঃপর আমি তার জন্য সাতটি কঙ্কর কুড়ালাম।

* রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীর উটসমূহ জবাই করার সময় অবশিষ্ট কিছু উট জবাই করার দায়িত্ব হযরত আলী (রা) কে দিলেন [৪২৫], কোরবানিকৃত পশুর গোশত চামড়া ও আনুষঙ্গিক জিনিসসমূহ সদকা করে দিতেও তাকে দায়িত্ব দিলেন।[৪২৬]

* রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাতো ভাইদের কাছে পানি পান করতে চাওয়াও এ-পর্যায়ে পড়ে। তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (রা) কে বললেন : আমাকে পানি পান করান অতঃপর তিনি তা থেকে পান করলেন।"[৪২৭] হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক বর্ণনায় বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যমযমের পানি পান করালাম, অতঃপর তিনি পান করলেন দাঁড়ানো অবস্থায়। [৪২৮]

এর আর একটি উদাহরণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র শরীর ও মাথায় হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক উত্তম আতর মাখিয়ে দেয়া। এই মর্মে হযরত আয়েশা বলেছেন : আমি আমার এই দুই হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সুগন্ধি মাখাতাম ইহরামের পূর্বে ও হালাল হওয়ার পর তোওয়াফ করার পূর্বে, তিনি তাঁর দু'হাত সম্প্রসারিত করে দেখালেন।" [৪২৯]

যারা স্বজনদেরকে ছেড়ে দূরবর্তী লোকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাদের আচরণ যে ভুল রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আদর্শ সে ইঙ্গিতই বহন করছে। হযরত মূসা (আ) কে আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে দেখা গেছে : " আমার পরিবারবর্গের মধ্যে একজনকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, আমার ভাই হারুনকে; এবং তাকে আমার কর্মে অংশী কর , যাতে তোমার পবিত্রতা কীর্তন

করতে পারি প্রচুর, এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক।"[৪৩০] লুত عليه السلام যখন তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আসা নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি তখন তাঁর স্বজনদের সহায়তা পাওয়ার প্রত্যাশায় বললেন :" আমার যদি তোমাদের বিষয়ে কোনো শক্তি থাকতো , অথবা আমি আশ্রয় নিতে পারতাম একটি সুদৃঢ় স্তম্ভের।" [৪৩১] অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে আত্মীয়স্বজনের সহায়তা নেয়াই হলো মানব প্রকৃতির আকুতি। দ্রুত কর্ম সম্পাদন ও উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্যকারী। আর যে ব্যক্তি স্বজনদের বিষয়ে উদাসীন, ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে তাদেরকে উৎসাহ দেয় না। সে তাদের উপকার থেকেও নিজেকে করে বঞ্চিত, ফলে বঞ্চিত হয় প্রভূত কল্যাণ থেকে।

৬- ফেৎনা থেকে স্বজনদেরকে হিফাযত করা

ফেৎনা হচ্ছে হৃদয়ের স্বচ্ছতা বিধ্বংসী , মেধা ও ভাবকে বিকৃতকারী। আর যখন বহুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা একত্রে জমায়েত হয় ফেৎনা সংঘটিত হওয়ার সুযোগও বেড়ে যায়। বিশেষ করে নারী সংক্রান্ত ফেৎনা। এ-জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সদস্যদের ফেৎনা থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। এর প্রমাণ :

হযরত ফযল ইবনে আব্বাসের গ্রীবা ঘুরিয়ে দেয়া যখন তিনি খাসআমিয়া গোত্রের মহিলার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন, আর তা এ আশংকায় যে শয়তান তাদের হৃদয়ে ফেতনার প্রবেশ ঘটাতে পারে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন : " হযরত আব্বাস বলেছেন : হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের গ্রীবা কেন ঘুরিয়ে দিলেন? তিনি বললেন : আমি একটি যুবক ও যুবতীকে দেখলাম অতঃপর শয়তানের আক্রমণ থেকে তাদেরকে নিরাপদ মনে করলাম না। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে : " আমি একটি যুবক ছেলে ও যুবতী মেয়েকে দেখলাম, অতঃপর তাদের ওপর শয়তানের আক্রমণের আশংকা করলাম।"[৪৩২]

পুরুষদের সম্মুখীন হলে ইহরাম অবস্থায় নবী পত্নীদের চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেলা এবং তারা অতিক্রম করে চলে গেলে পুনরায় চেহারা খুলে ফেলা এ অবস্থায় যে রাসূল তাদের সঙ্গে রয়েছেন।[৪৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে (রা) পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোওয়াফ করতে বলেছেন। যদিও তাঁরা পুরুষের সাথেই তোওয়াফ করতেন। হযরত উম্মে সালামার কথা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার সমস্যার ব্যাপারে কৈফিয়ত করলেন , এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন :"পুরুষদের পাশ দিয়ে আরোহিত অবস্থায় তোওয়াফ করো।"[৪৩৪] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে :" যখন ফযরের একামত দেয়া হয়, তখন তুমি উটের উপর সোওয়ার হয়ে তোওয়াফ করো এ অবস্থায় যে মানুষেরা নামাজ পড়ছে। অতঃপর আমি এরূপই করলাম।"[৪৩৫] ইবনে জুরাইজের হাদীসের ভাষ্যও এটাই। তিনি বলেন :" আতা' জানিয়েছেন , যখন ইবনে হিশাম মহিলাদেরকে পুরুষের সাথে তোয়াফ থেকে নিষেধ করেছেন, তিনি বললেন : কীভাবে সে নিষেধ করে! নবী পত্নীগণ তো পুরুষের সাথেই তোওয়াফ করেছেন। আমি বললাম : হিজাবের , পরে না আগে ? তিনি বললেন : বিশ্বাস করুন, আমি এ বিষয়টি হিজাবের পর পেয়েছি। আমি বললাম : তাহলে কীভাবে পুরুষের সাথে মিশে তোওয়াফ করতেন? তিনি বললেন : পুরুষের সাথে মিশে তোওয়াফ করতেন না বরং পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোওয়াফ করতেন।"[৪৩৬] হযরত আয়েশার এ কথা থেকেও বিষয়টি বুঝতে পারা যায় যে তিনি তার এক আজাদকৃত মহিলাকে বললেন যিনি সাতবার বায়তুল্লাহর তোওয়াফ করেছেন,দু'বার অথবা তিনবার হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন , তাঁকে তিনি বললেন : " আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান না দিন, আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান না দিন , তুমি পুরুষদের সাথে ভির ঠেলতে গিয়েছ, তুমি যদি তাকবির দিতে এবং অতিক্রম করে যেতে।" কারণ হযরত আয়েশা (রা) এমন জিনিস কখনোই ছাড়তে না যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করতে বলেছেন, অথবা কোনো জিনিস করা থেকে বারণ করবেন না যা রাসূলুল্লাহর সামনে করা হয়েছে।

নবী-পত্নীদেরকে বায়তুল্লাহর রমল করার অনুমতি না দেয়া ও সাফা মারওয়ার মাঝখানে বতনুল ওয়াদিতে দৌড়ে চলা থেকে বারণ করা এ পর্যায়ে পড়ে। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, হে মহিলাগণ ! আপনাদের বায়তুল্লাহর রমল করতে হবে না। এই ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের কাছ থেকে আদর্শ গ্রহণ করুন," [৪৩৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : আপনাদের জন্য কি আমরা আদর্শ নই? আপনাদের বায়তুল্লাহর রমল করতে হবে না,না আছে সাফা মারওয়ার মাঝখানে বেগে চলা।" [৪৩৮]

এ-পর্যায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নবী-পত্নীদেরকে হজ্বের পর যার যার ঘরে অবস্থান করতে বলা।

হজ্বে মূর্খতা ও ভিড়ের প্রবলতার কারণে দুর্বল-ইমানসম্পন্ন লোকদের বিপথগামী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় কিছু শরীয়তবহির্ভূত কাজের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার। যার ফলে আল্লাহর ভয় বুকে ধারণ করে, দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে হিফাযত করা, পবিত্র ভূমিতে গিয়েও আল্লাহর ভয়ে যাদের বুক কাঁপে না তাদের বলয় থেকে স্বজনদেরকে রক্ষা করা প্রতিটি ব্যক্তিরই দায়িত্ব হয়ে যায়। স্থান ও কাল সংক্রান্ত কিছু মুস্তাহাব যদি, এর ফলে, ছুটে যায় তবু। কারণ ক্ষতিকর বিষয় দমন সৎকর্ম সিদ্ধির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো যে অর্পিত দায়িত্ব পালন নিজের আওতাধীনদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে, এ ক্ষেত্রে অবহেলা, ডেকে আনে কঠিন শাস্তি। রাসূলূল্লাহ ﷺ বলেছেন : " যখন আল্লাহ পাক কিছু মানুষকে কারো দায়িত্বে দিয়ে দেন আর ওই ব্যক্তি তার আওতাধীনদের বিষয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেন।" [৪৩৯]

৭- পরিবারের সদস্যদেরকে অনাচার থেকে বারণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময়ই এ-বিষয়ে যত্নবান ছিলেন যে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কিছুতেই যেন কোনো অনাচারে জড়িত না হয়, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময়ই যত্নবান ছিলেন। তাই তাদের কেউ যখন কোনো মুনকারে জড়িয়ে

যাওয়ার উপক্রম করতেন তিনি ﷺ সাথে সাথে তাকে বারণ করতেন। যেমন ফযল ইবনে আব্বাসকে (রা) নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে বারণ করেছেন।

স্বীয় আলে বায়তকে রাসূল্লাহ ﷺ মানুষের জন্য আদর্শরূপে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি আরাফায় বক্তৃতার সময় অন্যদের কাছে স্বীয় পরিবারভুক্তদের প্রাপ্য সুদ ও অন্যায়ভাবে নিহত হয়ে যাওয়া ব্যক্তির প্রতিশোধ বাতিল করে দিয়ে এ ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

বর্তমান যুগে পাপাচার বেড়ে গেছে দারুণভাবে যা হয়তো ব্যক্তির হজ্বকে ধ্বংস করে দেয় অথবা এর পূর্ণতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মহিলাদের কিছু কিছু কদাচার; যেমন পর্দাহীনতা, ও পুরুষদের ভিরে মিশে যাওয়া ইত্যাদি। তাই আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে রহম করুন যে তার পরিবার সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, এবং স্বীয় আহলে বায়তকে পাপ কর্মে জড়িয়ে যাওয়া থেকে হিফাযত করে। তাদেরকে সৎকাজ করতে নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করে।

৮- হজ্বে পরিবারের সদস্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন

হজ্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে কোমল আচরণ করেছেন, তাদের প্রতি করুণা ও মমত্ববোধ দেখিয়েছেন, তাদের মধ্যে যে দুর্বল তার প্রতি তিনি অধিক নজর দিয়েছেন। হজ্বকর্ম যেভাবে সম্পাদন করলে সহজ হবে তার দিকনির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন। এর উদাহরণ অনেক, তন্মধ্যে–নবী-পত্নীদের জন্য যা সহজ তাদের জন্য তা পছন্দ করা ও সে অনুযায়ী আমল করতে বলা। যেমন হযরত হাফছার হাদীস অনুযায়ী

'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের (রা) কে বিদায় হজ্বের সময় (ওমরার পর) হালাল হয়ে যেতে বলেছেন।" [৪৪০]

হযরত যাবাআহ বিনতে যুবাইরকে (রা) অসুস্থতার কারণে শর্ত সংযুক্ত করে নিয়ত করার অনুমতি দেয়াও এ পর্যায়ে পড়ে।

স্বজনদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে মানুষজনের পূর্বেই মুযদালিফা থেকে প্রস্থান করে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রওনা হওয়ার অনুমতি দেয়াও এ

পর্যায়ের একটি উদাহরণ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি হাশেম গোত্রের দুর্বলদেরকে মুযদালিফা থেকে রাতের বেলায় প্রস্থান করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন,”[৪৪১] হযরত উম্মে সালামার কৈফিয়ত এবং তাঁকে পুরুষদের পাশে হয়ে আরোহিণী অবস্থায় তোওয়াফ করার অনুমতি, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) কে, হাজ্বীদের পানি পান করানোর প্রয়োজনে, মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের অনুমতি দেয়া ইত্যাদি আলোচ্য বিষয়টিরই কয়েকটি উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে হাজ্বীদের সংখ্যা বর্তমান যুগের তুলনায় অত্যন্তই কম ছিল। সাথে সাথে সে সময় যারা হজ্ব করেছেন তাঁরা ছিলেন এ-উম্মতের স্বর্ণযুগের মানুষ, সব থেকে বেশি পরহেজগার , আল্লাহ-ভীরু, নম্র-ভদ্র ও অধিক গুরুগম্ভীর, তা সত্ত্বেও নবী ﷺ তাঁর আহলে বায়তের প্রতি এতোই নজর রেখেছেন, তাদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন, তাদের পাশে থেকেছেন, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। অবস্থা যদি এই হয় তাহলে আমাদের বর্তমান যুগে বয়োবৃদ্ধ হাজ্বী, মহিলা ও শিশুদের সাথে কোমল আচরণ ও তাদের পাশে দাঁড়ানোর কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না। কেননা হাজ্বীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে হজ্বসংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞানতাও বেড়ে গেছে। আর এত মানুষের একসাথে হজ্ব করায় দয়া ও মমত্ববোধও কমে গেছে প্রকট আকারে। তাই আপনার স্বজনদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের জন্য শরীয়তের আওতায় থেকে যা সহজ তা অবলম্বন করুন। এটাই আপনার জন্য উত্তম এবং আশা করা যায়, আপনার ছওয়াবও ,এর ফলে, বহুগুণে বেড়ে যাবে।

৯. পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে ধৈর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবাপরিজনদের জন্য শিক্ষক ও একই সাথে তাদের সেবাযত্নকারীও ছিলেন। আর তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ ছিলেন বৃদ্ধ ও মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারী , যেমন সাওদা (রা); কেউ অসুস্থ যেমন যাবাআহ ও উম্মে সালামাহ; আর সাথে ছিলেন অনেক মহিলা যেমন নবী তনয়া ফাতিমা

(রা) ও সকল উম্মহাতুল মুমিনিন; বনি আব্দুল মুত্তালিব ও বনু হাশেমের শিশুরা তো আছেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ধৈর্যের মতো এমন ধৈর্য আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। পরিবার-পরিজনদের বিষয়ে তাঁর চেয়ে অধিক সহনশীল খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব। কারণ তিনি পথ দেখিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন , করুণা ও কোমলতা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করেছেন , তাদের প্রতি এহসান করেছেন। তাদের যত্ন নিয়েছেন, সমস্যা ও অভাবে এগিয়ে এসেছেন, তাদের সাথে কখনো-সখনো মৃদু কৌতুকও করেছেন। তিনি তাদের অধিকার রক্ষা করেছেন, ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, তাদের বিষয়-আশয় পরিচালনা করেছেন সুন্দরভাবে। আর এসবই করেছেন আনন্দচিত্তে। বিরক্তিবোধ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি তাঁকে কখনো ।

এটাই হলো মুহাম্মদী চরিত্র ও কোরআনী আখলাক যা মানবিক মহানুভবতাকে প্রকাশ করছে উজ্জ্বলভাবে। পরিবার-পরিজনদের প্রতি ধৈর্য খুবই ঠিক কাজ। আর এ কাজটি মহান ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেউ সহজে করতে পারে না। কেননা প্রাত্যহিক মেলামেশা ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভয়-ভীতি কমিয়ে দেয়। যার ফলে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে, ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে সহনশীল ও ধৈর্যধারণকারী হতে হয়। বিশেষ করে হজ্বমৌসুমে যেখানে বেড়ে যায় মানুষের উপস্থিতি, সীমা ছাড়িয়ে যায় কষ্ট-ক্লেশের মাত্রা।

অতঃপর কেউ কি আছেন ছোয়াব প্রত্যাশী? পরকালে আগ্রহী ? যিনি তার পরিবার পরিজনদের বিষয়ে, ছেলে সন্তানদের বিষয়ে, নিজেকে ধৈর্যের বলয়ে আবদ্ধ করবেন? যিনি হবেন নেতৃত্ব ও উচ্চাসনের দরজায় কড়া নাড়তে আগ্রহী। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে: "আমি তাদেরকে নেতৃত্বদানকারী বানালাম, যারা আমার নির্দেশে মানুষদেরকে পথ দেখাবে; যখন তারা ধৈর্যধারণ করল,আর আমার আয়াতসমূহের প্রতি তারা ছিল বিশ্বাসী।"[৪৪২] আর এ ধৈর্যই হলো আল্লাহর মহব্বত ও সাহায্য লাভের পথ। যেমন এরশাদ হয়েছে :" আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।" [৪৪৩]

১০- পরিবারের লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও সান্ত্বনা দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সদস্যদের মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উল্টো পথবর্তী না হলে তাদের ইচ্ছা পূরণে তিনি এগিয়ে আসতেন। কোন বিষয়ে তাদের ইচ্ছা পূরণ সম্ভব না হলে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। হজ্বে এর একটি বিমূর্ত উদাহরণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশাকে একদা কাঁদতে দেখলেন; কারণ তিনি ঋতুবতী হয়ে যাওয়ার কারণে ওমরা আদায় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, বললেন এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই , কেননা তুমি তো আদমের মেয়েদেরই একজন। আল্লাহ তোমার জন্য ঠিক একই নিয়ম নির্ধারণ করেছেন যা করেছেন তাদের জন্য। হজ্ব চালিয়ে যাও আল্লাহ হয়তো ওটারও সুযোগ করে দিবেন। [৪৪৪] হযরত আয়েশা যখন বললেন, য়্যা রাসূলুল্লাহ ! আমার সঙ্গিনীরা একটি হজ্ব ও একটি ওমরা নিয়ে ফিরে যাবে আর আমি শুধুই হজ্ব নিয়ে ! রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকর (রা) কে নির্দেশ দিলেন তানঈমে নিয়ে যেতে, অতঃপর তিনি সেখান থেকে ওমরার উদ্দেশে তালবিয়া পড়লেন। অন্য এক বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশাকে বললেন : "তোমার তোয়াফ, হজ্ব ও ওমরা, উভয়টার জন্যই যথেষ্ট। হযরত আয়েশা নিজেকে রাজি করাতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকর (রা) কে বললেন হযরত আয়েশাকে নিয়ে তানঈমে যেতে। আর তিনি সেখান থেকে হজ্বের পর ওমরা করলেন।"[৪৪৫]

আজকের দিনে, স্ত্রীদের-স্বজনদের বিষয়ে, রাসূল ﷺ এর এ-আদর্শের অনুসরণ করছে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই কঠিন; সাম্প্রতিককালের অধিকাংশ মানুষ বরং দুই প্রান্তিকতার একটিতে স্থির হয়ে বসে গেছে–

এক. যারা স্ত্রী সন্তানের কামনা-বাসনা পাইয়ে দেয়াই নিজেদের জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি, পছন্দ অপছন্দ, যাদের প্রেরণার জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে।

দুই. এর বিপরীতে অন্য আরেক দল রয়েছে যারা স্ত্রী সন্তানের সাথে রূঢ় ও কঠিন আচরণে অভ্যস্ত। বিষণ্ন চেহারা, কুঞ্চিত-ভ্রূ, রক্তচক্ষু প্রদর্শন যাদের

অভ্যাস। দেওয়া-নেয়া, স্ত্রী সন্তানের অভিযোগ শোনা, তাদের সমস্যার সমাধান খোঁজে বের করা, সান্ত্বনা দেয়া, ইচ্ছার মূল্যায়ন ইত্যাদি যাদের কাছে একাবারেই অপরিচিত। পরিজনদের সাথে যাদের সম্পর্কের ধরন হলো কেবলই রূঢ় ও নিষ্ঠুর আদেশ-নিষেধ, দ্রুত কর্ম সম্পাদনের দাবি, অপেক্ষা অথবা ওজর আপত্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনেই যাদের রয়েছে পরম তৃপ্তি।

১১- স্বজনদের সাথে কোমল আচরণ

হজ্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে ছিলেন কোমল, বিনম্র , সহাস্য ও মিষ্টভাষী। আদর-স্নেহে তাদের ভরে রাখতেন সদাসর্বদা। তাদের সাথে নরমভাবে আচরণ করতেন। স্বজনদের, ছেলে সন্তানদের, সাথে সহাস্য আচরণ ও রসিকতাও করতেন। রাসূলূল্লাহ ﷺ হজ্বের নিয়ত করলেন এবং হযরত আয়েশা ওমরার, এ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত জাবের (রা) বলেন : ‘ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনম্র মানুষ ছিলেন, হযরত আয়েশা কোন কিছুর আগ্রহ ব্যক্ত করলে তিনি তার ইচ্ছা পূরণে সচেষ্ট হতেন।”[৪৪৬]

স্বজনদের সাথে কোমল আচরণের উদাহরণ অনেক, তন্মধ্যে :

তিনি তাঁর আত্মীয়া যাবাআ’কে বললেন,‘ - তোমার হজ্ব করতে বাধা কীসের? [৪৪৭]

হযরত আয়েশা ঋতুবতী হয়ে কান্না শুরু করে দিলে তিনি তার পাশে গিয়ে বললেন, ‘ এই! তোমার কি হলো ?’ [৪৪৮]

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাও এ-পর্যায়ে পড়ে। তিনি বলেন : আমরা বনি আব্দুল মুত্তালেবের বাচ্চারা উটের পিঠে চড়ে মুজদালিফা থেকে এলাম। তিনি আমাদের উরুতে মৃদু আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, প্রিয় বাচ্চারা তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে কঙ্কর মেরো না’ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ‘আমার ভ্রাতুষ্পুত্ররা, হে হাশিমের সন্তানরা : মানুষের ভিড়ের আগেই দ্রুত যাও, আর তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয়ের আগে আকাবায় কঙ্কর না মারে।” [৪৪৯]

স্বজনদের সাথে রাসূলের এই কোমল ও দয়ার্দ্র আচরণের উদাহরণ বর্তমান যুগের হজ্ব পালনকারীদের মধ্যে কি আদৌ দেখা যায়?−যায় না। এর

উল্টো, বরং, অনেককেই দেখা যায় হজ্বে তাদের স্বজনদেরকে অবজ্ঞা-অবহেলা করতে। কঠোরতা, দুর্ব্যবহার ও রূঢ় আচরণের মাধ্যমে স্বজনদের অন্তরাত্মা বিষিয়ে তুলতে।

এরূপ যারা করে, ভুলেও তাদের অনুসরণ করতে যাবেন না। কেননা এ ধরনের আচরণ হিংসার জন্ম দেয়, উদ্রেক করে ঘৃণার, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে হৃদয়ে হৃদয়ে, বরং হজ্বের সিদ্ধতার বিপক্ষেও যেতে পারে। পাপ মুছে যাওয়া ও আল্লাহর মাগফিরাতের পথে বাধাও হয়ে দাঁড়াতে পারে এ ধরনের আচরণ।

১২- স্বজনদের প্রতি এহসান

পরিবারের সদস্যদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এহসান বিচিত্র ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। ভেবে দেখলে মনে হবে তাদের সাথে রাসূলুল্লাহর সকল আচরণ ছিল ইহসান ও মহানুভবতাশ্রিত। স্বজনদের মাঝে রাসূলুল্লা ﷺ কে যেদিক থেকেই দেখা যাবে সেদিকেই উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়বে তাঁর দান, অনুগ্রহ , উদারতা। এর প্রমাণ বহু, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:

পরিবারের সকল সদস্যই তাঁর ﷺ সাথে হজ্ব করুক এ-আগ্রহও এ পর্যায়েরই একটি প্রমাণ। এমনকী তাদের মধ্যে কেউ যেতে মনস্থির না করলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়ে প্রস্তুত করেছেন। যাবাআর (রা) কাহিনি এরই দলিল বহন করছে, রাসূলূল্লাহ ﷺ তার ওখানে গেলেন এবং বললেন: "হজ্ব করতে কি ইচ্ছা করেছ ? তিনি বললেন : আমিতো নিজেকে ব্যথাগ্রস্ত পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হজ্ব করো এবং শর্ত করে বলো :" হে আল্লাহ ! যেখানে তুমি আমাকে ঠেকিয়ে দিবে সেখানেই হবে আমার হালাল হওয়ার জায়গা"।[৪৫০]

হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল স্ত্রীদের (রা) সঙ্গে নিয়ে আসেন। এ-বিষয়টি স্ব-পরিবারের প্রতি এহসানের অতি উজ্জ্বল উদাহরণ। কেননা তাঁদের কাউকে না নিয়ে আসলেও পারতেন অথবা লটারি দিয়ে যার নাম ওঠে কেবল তাকেই নিয়ে আসতে পারতেন, কিন্তু এরূপ না করে সবাইকে সঙ্গে নিয়েই তিনি বের হলেন।

চাচাতো ভাই ফযল ইবনে আব্বাসকে (রা) সহ-আরোহী করে নিয়ে মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়া একই পর্যায়ে পড়ে।

বলার আগেই স্ত্রী গণের পক্ষ থেকে কোরবানি করা, একই ধারাবাহিকতার ঘটনা। তিনি ﷺ তাঁদের পক্ষ থেকে গরু কোরবানি করেছিলেন।

মানবিক মহানুভবতা ও পূর্ণতার এ এক মহান দিক। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম, আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।"[৪৫১] এহসানের আকার-প্রকারের কোন শেষ নেই , তবে এর সর্বোত্তমটি হলো এমন বিষয়ে এহসান করা যা তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির স্পর্শে নিয়ে যায়। এজন্যই মানুষদেরকে ব্যাপক ও সাধারণভাবে আহ্বানের নির্দেশের পাশাপাশি স্বজনদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'লা। তিনি বলেছেন :" সতর্ক করো তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে,"[৪৫২] তাই, ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার এহসানের দাবিদার হলো আপনার আত্মীয় ও স্বজনেরা। এ ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নত বাস্তবায়ন করুন - উত্তম প্রতিদান পাবেন, এর বরকত, আজ হোক কাল হোক , নিশ্চয়ই ধরা পড়বে আপনার নিজের চোখেই।

১৩ - স্বজনদের অধিকার রক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষা করেছেন নিখুঁতভাবে। হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) এক বর্ণনায় এ-বিষয়টি মূর্ত হয়ে ধরা পড়ে। তিনি বলেন :" রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তিনি হাজরে আসওয়াদ বক্রাগ্র লাঠি দিয়ে স্পর্শ করতে থাকেন। শেষে তিনি পানি পানের জায়গায় আসেন। তার চাচাতো ভায়েরা পানি ওঠাচ্ছিলেন। তিনি বললেন আমাকে দাও ! বালতি উঠানো হলো। রাসূলুল্লাহর পান করলেন, ও বললেন : মানুষ এ-পানি উঠানোকে হজ্বের অংশ হিসেবে মনে করবে ও তোমাদের কাছ থেকে এ বিষয়টি কেড়ে নিবে এ-ধরনের আশংকা না হলে আমি তোমাদের সাথে পানি ওঠাতাম।"[৪৫৩] তাই হজ্বে আপনার স্বজনদের কোন অধিকার বিষয়ে

আশঙ্কা অনুভব করলে আপনি প্রথমে তাদেরকে তাদের দাবি উঠিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করুন ও বিবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে বারণ করুন– শুধুই প্রতিদানের আশায়, আর এটাই উত্তম। রাজি না হলে তাদের অধিকার যাতে রক্ষিত হয় এবং অন্যরা যাতে তা আত্মসাৎ করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

হজ্বে পরিবার পরিজনের মাঝে রাসূলুল্লাহর অবস্থা ও তাদের সাথে আচরণধারার এ ছিল কিছু খণ্ড চিত্র। আপনার পরিবার আপনার বড়ো মূলধন, এ-কথায় আপনি বিশ্বাস করলে হজ্বে তাদের সাথে আপনার অবস্থা ও আচরণবিধিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থা ও আচরণের সাথে তুলনা করে দেখুন তবেই আঁচ করতে পারবেন পার্থক্যটা কোথায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ অনুসরণের ইচ্ছা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করুক আপনার দায়দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করতে। অতঃপর আপনি, তাদের পরকাল ও প্রতিপালকের দণ্ড থেকে রক্ষা করবে, এমন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিন। তাদের পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যতটুকু করছেন তার চেয়েও শতগুণে বেশি করুন তাদের পরকালীন সুখের জন্য। তাদের হজ্ব , ইবাদত-বন্দেগি, চারিত্রিক উৎকর্ষ যাতে চূড়ান্ত পর্যায়ের সুষমা পায়, সুন্দরতমরূপে আদায় হয় তার জন্য যা কিছু শেখাতে হয় সবকিছুই তাদের ইখলাসের সাথে শেখান। এসবই করবেন উত্তম আচরণের আদলে, যেভাবে আচরণ করেন আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর সাথে –তার থেকেও বহুগুনে উত্তমভাবে; কারণ তাদের অধিকার আপনার ওপর প্রচুর। আপনার দায়িত্বও তাদের প্রতি বিশাল। তাই সিরিয়াস হন। আল্লাহর সামনে লুটিয়ে পড়ু ন, অবনত হন; যাতে তিনি আপনাকে সাহায্য করেন ও সোজা পথে পরিচালিত হতে তাওফিক দেন।

টীকা

[১] - সূরা আল-বাকারা : ৭
[২] - সূরা আল-আহযাব :২১
[৩] - সূরা আল ইমরান: ৩১
[৪] - সূরাতুন্নিসা : ৮০
[৫] - সূরাতুন্নিসা:৬৯
[৬] - আল -বাকারা : ১৯৬
[৭] - এ-বিষয়ে একটি হাসান হাদীস রয়েছে , দ্রঃ ইবনে খুযাইমাহ , হাদীস নং ২৬২৮
[৮] - সহীহ মুসলীম , হাদীস নং ১২১৮
[৯] - সহীহ বুখারী, ৫৯১৫, সহীহ মুসলিম, ১১৮৪
[১০] - ইবনে মাজাহ :২৮৯০
[১১] - আবু দাউদ, হাদীস নং ১৯০৯ , মুহাদ্দীস আলবানী এহাদীসটি শুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন।
[১২] -আবুদাউদ :১৯১৯
[১৩] - তিরমিযি :৮৬৯
[১৪] - তিরমিযি, হাদীস নং ৩৫৮৫, মুহাদ্দীস আলবানী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, দ্রঃ সহীহ সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং ২৮৩৭
[১৫] - বুখারী , হাদীস নং ১৩৯৫
[১৬] - সূরা হাজ্ব ঃ ৩২
[১৭] - সূরা হাজ্ব ঃ ৩০
[১৮] - সূরা আল-বাকারাহ :২২৯
[১৯] - সূরা নিসা : ১৪
[২০] - তিরমিযি , হাদীস নং ৮৩০ , মুহাদ্দীস আলবানী এহাদীসটি বিশুদ্ধ বলেছেন, দ্রঃ সহীহু সুনানুততিরমিযি , হাদীস নং ৬৬৪
[২১] -বুখারী , হাদীস নং ১৫৪
[২২] - সহীহ মুসলীম : হাদীস নং ১১৮৯
[২৩] - বুখারী, হাদীস নং ৫৯২৩
[২৪] -সূরা হাজ্ব : ৩৬

[২৫] - সহীহ মুসলীম, হাদীস নং ১২৪৩
[২৬] - ইবনে কাছির: আসসিরাহ আন্নাবুবিয়াহ : ২২৮/৪
[২৭] - ইবনে খুজাইমাহ : হাদীস নং ২৬০৯
[২৮] - সহীহ মুসলীম : হাদীস নং ১৩২৪
[২৯] - সহীহ ইবনে খুযাইমাহ , হাদীস নং ২৮০৬
[৩০] -বুখারী : হাদীস নং ৫৯১৫
[৩১] - মুসনাদে আহমদ : হাদীস নং ২৯৫০
[৩২] -সহীহ মুসলীম : ১২৪৭
[৩৩] - সহীহ মুসলীম : ১২৫৯
[৩৪] -বুখারী, হাদীস নং ১৬১৫
[৩৫] - সহীহ মুসলীম : ১২৭১
[৩৬] - মুসনাদে আহমদ , হাদীস নং ১৩১
[৩৭] - বায়হাক্কি : আস্‌সুনানুল কুবরা : ৫/৭৪ এর সনদটি বিশুদ্ধ
[৩৮] - বায়হাক্কি : আস্‌সুনানুলকুবরা ৫/৭৪
[৩৯] - আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৭৬ মুহাদ্দীস আলবানী এহাদীসটি হাসান বলেছেন, দ্রঃ সহীহু সুনানিআবি দাউদ , হাদীস নং ১৬৫২
[৪০] - সূরা আল-বাকারা : ১২৫
[৪১] -সূরা আল-বাকারাহ : ১৫৮
[৪২] -সহীহ মুসলীম , হাদীস নং ১২১৮
[৪৩] -সূরা আল-বাকারাহ :১২৫
[৪৪] - তিরমিযি, হাদীস নং ৮৫৬
[৪৫] - সূরা আল-বাকারাহ :১৯৮
[৪৬] - সহীহ মুসলীম , হাদীস নং ১২১৮
[৪৭] -ইবনে খুযাইমাহ, হদীস নং ২৯৩৪
[৪৮] - আবুদাউদ, হাদীস নং ১৭৬৫
[৪৯] - তিরমিযি, হাদীস নং ৭৭৩
[৫০] - বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩ , মুসলীম: হাদীস নং ১৩৪৯
[৫১] - বুখারী, হাদীস নং ১৮১৯
[৫২] - সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৭
[৫৩] - ইবনুল কাইয়েম : আলজাওয়াব আল কাফী :৯৮
[৫৪] - সূরাতুল ইসরা :৮১
[৫৫] -সূরা সাবা: ৪৯
[৫৬] - বুখারী, হাদীস নং ১৬০১
[৫৭] - সূরা তাওবাহ :২৮

[৫৮] - বুখারী, হাদীস নং ৩৬৯
[৫৯] - বায়হাক্বী : আস্‌সুনানুল কোবরা, হাদীস নং ৫/১২৫
[৬০] - সহীহ মুসলীম : হাদীস নং ১২১৮
[৬১] - ইবনু মাযাহ : হাদীস নং ৩০১১
[৬২] - সহীহ মুসলীম :১৬৬
[৬৩] - সহীহ মুসলীম : ১২৫২
[৬৪] - সহীহ মুসলীম :১১৮৫
[৬৫] - বুখারী :১৬৬৫
[৬৬] - বায়হাক্বী : আস্‌সুনানুলকবরা : ৫/১২৫
[৬৭] - বুখারী :১৬৮৪
[৬৮] - আবুদাউদ :১৯৮৭
[৬৯] - বুখারী : ১৫৯০
[৭০] - যাদুল মায়াদ : ২/১৯৪-১৯৫
[৭১] - ইবনে হাজার : ফাতহুলবারী, ৩/৫৬৫
[৭২] - বুখারী :১৬২২
[৭৩] - বুখারী :৭২৩
[৭৪] - ইবনু খুযাইমাহ :২৭৬৪
[৭৫] - আল-বাকারাহ :১৫৮
[৭৬] - বুখারী : ১৬৪৩
[৭৭] - আবুদাউদে ইবনুল কাইয়েমের হাশিয়া : ৫/১৪৬
[৭৮] -আবুদাউদ :৪০৩১
[৭৯] - হাকেম এহাদীসটি মুস্তাদরাকে উল্লেখ করেছেন : ৩/ ১৯ বুখারীতে হযরত ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ একটি হাদীস রয়েছে : হাদীস নং ৬১৬৯
[৮০] - ইবনে হাজার : ফাতহুলবারী , ১১/৯৮
[৮১] - তিরমিযি :২৯৬৯
[৮২] - দ্রঃ মুবারকপুরী , তুহফাতুল আহওয়াযী : ৯/২২০
[৮৩] - ইবনু হিব্বান: ৮৭০
[৮৪] - আবু দাউদ :১৮৯২
[৮৫] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম : ১২১৮
[৮৬] - দ্রঃ বুখারী : ১৭৫১
[৮৭] - যাদুল মায়াদ : ২/২৮৫
[৮৮] - আন্‌নাসায়ী : ২৯৬১
[৮৯] - সূরা আল-বাকারা :১৯৯-২০৩
[৯০] - সূরা আলহাজ্ব :২৮

[৯১] - তিরমিযি : ৯০২
[৯২] - আবুদাউদ : ১৮৯২
[৯৩] - বুখারী :১৫৩৪
[৯৪] - সহীহ মুসলীম :১২১১
[৯৫] - বুখারী :১৭৭২
[৯৬] - বুখারী :৭২৮৮
[৯৭] - উদাহরণস্বরূপ দেখুন বুখারী : ১৭৫১, মুসলীম :১২১৮
[৯৮] - বায়হাক্কী : আস্সুনুলকুবরা : ৫/৭৪
[৯৯] - বুখারী : ১৭৫১, ১৭৫৩
[১০০] -নাসায়ী :৩০২৪ , আলবানী এহাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, দ্রঃ সহীহু সুনানিননাসায়ী : ২৮২৭
[১০১] - মুসনাদে আহমদ : ১৮১৬
[১০২] - বুখারী :১৬৭১
[১০৩] - সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৭
[১০৪] - সূরা আল-ইমরান : ১৩৩
[১০৫] -তিরমিযি : ৮৩০
[১০৬] - বুখারী :১৫৩৯
[১০৭] - বুখারী : ১৫৪৫,১৬৯৭
[১০৮] - বুখারী :১৫৪৪
[১০৯] - বুখারী : ১৬১৫
[১১০] - দ্রঃ বুখারী :৬১৬
[১১১] - দ্রঃ বুখারী : ১৬০৯
[১১২] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম : ১২১৮,১২৬১
[১১৩] - দ্রঃ বুখারী :১৭৫১
[১১৪] - দ্রঃ বুখারী : ১৬৮০
[১১৫] - দ্রঃ বুখারী : ১৭১৮
[১১৬] - দ্রঃ বুখারী : ১৬৮৮
[১১৭] - দ্রঃ ইবনে মাজাহ :৩০৭৪
[১১৮] - দ্রঃ সহীহ ইবনে খুযায়মাহ :২৬০৯ এহাদীসের সনদ বিশুদ্ধ
[১১৯] - দ্রঃ সুনানে ইবনে মাজাহ :৩০২৯
[১২০] - দ্রঃ মুসনাদে আহমদ : ২৭২৯০
[১২১] - দ্রঃ বুখারী :১৬০৮
[১২২] - দ্রঃ বুখারী :১৭১৫
[১২৩] - সহীহ মুসলীম :২৬৯৯

[১২৪] - মুসনাদে আহমদ: ১৯৭৮৬
[১২৫] - বুখারী :৬৪৬৩
[১২৬] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২১৮
[১২৭] - দ্রঃ বুখারী :১৬৫৮
[১২৮] - দ্রঃ বুখারী :১৬৭৩
[১২৯] - দ্রঃ বুখারী :১৬৬৬
[১৩০] - দ্রঃ বুখারী :১৬০৭
[১৩১] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১৩১৩
[১৩২] - সহীহ মুসলীম :১২৯৮
[১৩৩] - বুখারী : ৫০৬৩
[১৩৪] - বায়হাক্বী , শুয়াবুল ইমান: ৩৮৮৫
[১৩৫] - মুসনাদে আহমদ:১৭৭৭৩
[১৩৬] - বুখারী :৬৪৬০
[১৩৭] - সহীহ মুসলীম:১০৫৫
[১৩৮] - সহীহ মুসলীম :২৯৭৮
[১৩৯] - সহীহ মুসলীম :২৯৭০
[১৪০] -বুখারী :৫৪৩৮
[১৪১] - সহীহ ইবনে খুযাইমাহ :২৮৩১
[১৪২] - মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ :৩/৪৪২
[১৪৩] - দ্রঃ ইবনে মাযাহ : ২৮৯০
[১৪৪] - যাদুল মাআদ:২/১৬০
[১৪৫] - আবু দাউদ: ৪১৪৪
[১৪৬] - দ্রঃ বুখারী : ১৫৪৪
[১৪৭] - বুখারী : ১৬৩৬
[১৪৮] -মুসনাদে আহমদ :১৮১৪
[১৪৯] - দ্রঃ বুখারী : ১৭১৮
[১৫০] - সহীহ মুসলীম :১৩১৭
[১৫১] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম : ৩১৮০
[১৫২] - আবুদাউদ :১৬৩৩
[১৫৩] - সহীহ মুসলীম : ১৯৭৫

[১৫৪] - সহীহ মুসলীম : ১৪৭৮
[১৫৫] - সহীহ মুসলীম :৫৩৭(এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন মাওয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস্‌সুলামী)

[১৫৬] - বুখারী :১৫৫১
[১৫৭] - আবুদাউদ: ১৯০৫
[১৫৮] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১১৮৭,১২১৮,১২৭৩
[১৫৯] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২৭৪
[১৬০] - ইবনে মাজাহ :৩০৩৫
[১৬১] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২৯৭
[১৬২] - দ্রঃ ইবনে মাজাহ :৩০২৪
[১৬৩] - বুখারী :১২১
[১৬৪] - ইবনে মাজাহ :৩০২৪ আলবানী এহাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন
[১৬৫] - দ্রঃ বুখারী :১৭৪১
[১৬৬] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২১৮
[১৬৭] - দ্রঃ ইবনে কাছির, সিরা নাবুবিয়াহ :৪/৩৪২
[১৬৮] - দ্রঃ আবুদাউদ : ১৯৫৬
[১৬৯] - দ্রঃ তিরমিযি :৮৮৩ আলবানী এ হাদীসটি বিশুদ্ধ বলেছেন।
[১৭০] - ইবনে মাজাহ :৩০২৫
[১৭১] - সহীহ মুসলীম :১২০৭
[১৭২] - বুখারী :৪৬৪
[১৭৩] - বুখারী : ১৬৭৯
[১৭৪] - নাসায়ী : ৩০৫৯
[১৭৫] - আবু দাউদ:১৯৪০
[১৭৬] - আবুদাউদ:১৮৮৮
[১৭৭] -তিরমিযি : ৩৫৮৫
[১৭৮] - সহীহ ইবনে খুযাইমাহ :২৭২৯
[১৭৯] - ইবনে মাজাহ :২৭৫৬
[১৮০] - তিরমিযি: ৮২৭
[১৮১] - মুসান্নাফে আব্দুররাজ্জাক : ৮৮৩০
[১৮২] -ইবনে মাজাহ :৩০২৪
[১৮৩] -আলমুসতাদরাক লিল হাকেম :১/৬৩২
[১৮৪] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২১৮ , তিরমিযি :৮৮৫
[১৮৫] -তিরমিযি :৬১৬
[১৮৬] - মুসনাদে আহমদ:১৮৯৮৯
[১৮৭] -বুখারী : ১২৬৭
[১৮৮] - সহীহ মুসলীম : ১৩৩৫
[১৮৯] - বুখারী :৮৩

[১৯০] - সহীহ মুসলীম :১২৭৩
[১৯১] - বুখারী : ১৭৩৬
[১৯২] - বুখারী :৬২২৮
[১৯৩] - সহীহ মুসলীম :১২০৭
[১৯৪] - সহীহ মুসলীম:১২১৮
[১৯৫] - বুখারী :১৭৩৬
[১৯৬] - বুখারী :১৬৩৪
[১৯৭] - তিরমিযি :৯৫৫
[১৯৮] - মুসনাদে আহমদ :১৮১২
[১৯৯] - রাসুলুল্লাহর (স) উষ্ট্রীর নাম ছিলো কাসওয়া (অনুবাদক)
[২০০] -সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২০১] - সহীহ মুসলীম ;১২৬৪
[২০২] - মুসনাদে আহমদ:২৮৪২
[২০৩] -ইবনে মাজাহ: ৩০৩৫
[২০৪] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২০৫] -বুখারী :৩৮৩২
[২০৬] - তিরমিযি:৮৯১
[২০৭] - মুসনাদে আহমদ:১৪১১১৬
[২০৮] - সহীহ মুসলীম :১১৯৬
[২০৯] - বুখারী :১৫১৩
[২১০] - তিরমিযি :৮৮৯
[২১১] -সহীহ মুসলীম :১৩৩৬
[২১২] - দ্রঃ বুখারী :১৭৩৬
[২১৩] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২১৪] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২১৫] -দ্রঃ তিরমিযি: ৮৮৯
[২১৬] - দ্রঃ তিরমিযি :৮৯১
[২১৭] - দ্রঃ বুখারী :৮৩
[২১৮] -দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২৭৩
[২১৯] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১৩৩৬
[২২০] - সূরা আরাফ: ৩৩
[২২১] - বুখারী :১২৯১
[২২২] - সূরা ইব্রাহীম :৫
[২২৩] - সূরা আলগাশিয়াহ :২১

[২২৪] - সুরাতুল আলা : ৯-১০
[২২৫] - সূরা আযযারিয়াত :৫৫
[২২৬] - দ্রঃ বুখারী :৭০
[২২৭] - দ্রঃ তিরমিযি :২৬৭৬
[২২৮] - বুখারী :৭২৮৩
[২২৯] - সহীহ মুসলীম : ১২১৮
[২৩০] - বুখারী :১৬৭১
[২৩১] - বুখারী :১৭৪১,৪৪০৩, ৪৪০৬
[২৩২] - মুসনাদে আহমদ :২০৬৯৫
[২৩৩] - বুখারী : ১৭৪১
[২৩৪] - আবু দাউদ :২০১৫
[২৩৫] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২৩৬] - বুখারী : ৬৭
[২৩৭] - মুসনাদে আহমদ :২০৬৯৫
[২৩৮] - সহীহ ইবনে খুযাইমাহ :২৯৬০
[২৩৯] - বুখারী : ১৫২১
[২৪০] -ইবনে মাযাহ :৩০২৪
[২৪১] - তিরমিযি :৮৮৫
[২৪২] - ইবনুল কাইয়েম : যাদুল মায়াদ: ২/২৫৫-২৫৬
[২৪৩] - মুসনাদে আহমদ: ৬১৭৩
[২৪৪] - তিরমিযি :৬১৬
[২৪৫] - ইবনে মাজাহ :২৬৬৯
[২৪৬] -বুখারী :১৮১৯
[২৪৭] - বুখারী : ১৬৭১
[২৪৮] - আলমুসতাদরাক লিল হাকেম:১/৬৫৮
[২৪৯] - ইবনে মাজাহ :৩০২৯
[২৫০] -তিবরানী : আলমু'জামুল কাবীর :৪৮৪
[২৫১] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২৫২] - তিরমিযি :৩০৮৭
[২৫৩] - ইবনে মাজাহ :৩৯৩৬
[২৫৪] - মুসনাদে আহমদ :২৩৫৪৪
[২৫৫] - সহীহ মুসলীম :১৩৪৮
[২৫৬] - সূরা নিসা:৬৫
[২৫৭] - ইবনে হাজার : ফাতহুল বারী :১৩/২৮৯

[২৫৮] - ইবনুল কাইয়েম : মাদারিযুস্সালিন ২/ ৩৩২
[২৫৯] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২৬০] -বুখারী :১৫৯৫
[২৬১] - আবু দাউদ: ১৮৮৭
[২৬২] - ইবনে মাজাহ : ২৯৫২
[২৬৩] - ইবনে মাজাহ :২৯৫২
[২৬৪] - তিবরানী : আলমু'জামুল আওসাত :৫৮৪৩
[২৬৫] - দ্রঃ বুখারী :১৬০৬
[২৬৬] - তিরমিযি :৮২৪
[২৬৭] - সহীহ মুসলীম : ১২৩৩
[২৬৮] - সূরা আলআহযাব :২১
[২৬৯] - মুসনাদে আহমদ :২২৭৭
[২৭০] - সহীহ মুসলীম :১২৯৭
[২৭১] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[২৭২] - ইবনে মাজাহ :৩০৫৭
[২৭৩] - ইবনে মাজাহ :৩০২৯
[২৭৪] - মুসনাদে আহমদ :২১৮৬১
[২৭৫] - সহীহ মুসলীম : ১২১৬
[২৭৬] - সহীহ মুসলীম: ১২৪০
[২৭৭] - বুখারী :১৭৮৫
[২৭৮] - বুখারী : ৭৩৬৭
[২৭৯] - বুখারী :১৫৬৪
[২৮০] - দ্রঃ বুখারী : ৭৩৬৭
[২৮১] - সহীহ মুসলীম :১৭১৮
[২৮২] - বুখারী :৭২৮০
[২৮৩] - সূরা আল ইমরান :১০৩
[২৮৪] - সূরা মুমিনুন :৫২
[২৮৫] - সূরা রূম: ৩১ -৩২
[২৮৬] - বুখারী : ২৪৪৬
[২৮৭] - তিরমিযি :২১৬৬
[২৮৮] - মুসনাদে আহমদ :২৩৫৩৬
[২৮৯] - ইবনে মাজাহ :৩০৫৬
[২৯০] -সহীহ মুসলীম :২৮১২

[২৯১] - ইবনে মাজাহ : ৩০৫৭
[২৯২] - বুখারী :১২১
[২৯৩] - বুখারী : ৬৭
[২৯৪] - মুসনাদে আহমদ :২০৬৯৫
[২৯৫] - আবু দাউদ :২০১৫
[২৯৬] - ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব : মুখতাসারুসসিরাহ : ৫৭২
[২৯৭] - সূরা আল-বাকারাহ :৪৪
[২৯৮] - সূরা রাফফ :২-৩
[২৯৯] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[৩০০] - দ্রঃ বুখারী : ১৭৫১
[৩০১] - ইবনে মাজাহ :২৮৯০
[৩০২] - তিরমিযি : ৮৮৬
[৩০৩] - দ্রঃ বুখারী : ১৭২৯
[৩০৪] -সহীহ মুসলীম :১২৯৯
[৩০৫] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[৩০৬] - গাযালী , এহয়ায়ু উলুমিদ্দিন : ২/৩০৬
[৩০৭] - সূরা আলমায়িদাহ : ৯৯
[৩০৮] - সূরা আলকাসাস :৫৬
[৩০৯] - সূরা আল-আরাফ :১৯৯
[৩১০] - সূরা আল-আরাফ :১৫৭
[৩১১] - আবু দাউদ :১৮১১
[৩১২] - বুখারী :৭৩৬৭
[৩১৩] - বুখারী : ১৬২০
[৩১৪] - সহীহ মুসলীম : ১২১৮
[৩১৫] - বুখারী : ১৮৫৫
[৩১৬] - বুখারী :২১৭২
[৩১৭] -সহীহ মুসলীম :১০১৭
[৩১৮] - সহীহ মুসলীম :২৫৮৮
[৩১৯] - সূরা আশশুয়ারা :২১৫
[৩২০] - শারহুস্‌সুন্নাহ লিলবাগবি : ৩৬৮৩
[৩২১] -বুখারী: ৩৪৪৫
[৩২২] - ইবনে মাজাহ :২৮৯০
[৩২৩] - মুসনাদে আহমাদ:১৮১৪
[৩২৪] -বুখারী :১৫৪৪

[৩২৫] - সহীহ মুসলীম : ১২৭৪
[৩২৬] - গাযালী , এহয়াউ উলুমদ্দিন : ৩/৩৪২
[৩২৭] - সূরা আলআম্বিয়া: ১০৭
[৩২৮] - সহীহ মুসলীম : ২৫৯৯
[৩২৯] - সহীহ মুসলীম : ২৩৫৫
[৩৩০] - সূরা তওবা: ১২৮
[৩৩১] - তিরমিজি :১৫৯৭
[৩৩২] - বুখারী :৬২৮
[৩৩৩] - সহীহ মুসলীম : ২৩১৬
[৩৩৪] - শারহুননববী লি-মুসলীম :১৫/৭৬
[৩৩৫] - দ্রঃ বুখারী :৮৩
[৩৩৬] - বুখারী :১৭৪৫
[৩৩৭] - দ্রঃ তিরমিযি : ৯৬৮
[৩৩৮] - সহীহ মুসলীম :১৩৩৫
[৩৩৯] - সহীহ মুসলীম :২২১৭
[৩৪০] - বুখারী :৪৬৯৯
[৩৪১] - বুখারী :৫৯৯৭
[৩৪২] - বুখারী :৭৩৭৬
[৩৪৩] -বুখারী :১৫৮৪
[৩৪৪] সূরা ফুসসিলাত :৩৪
[৩৪৫] - বুখারী :২৫৬৭
[৩৪৬] - বুখারী :৬
[৩৪৭] - সহীহ মুসলীম :২৩১২
[৩৪৮] - সহীহ মুসলিম : ১৬৭৯
[৩৪৯] - দ্রঃ বুখারী :১৫১৮ ,১৬৮০
[৩৫০] - বুখারী :১৫৪৪
[৩৫১] - সহীহ মুসলীম :১২১৮
[৩৫২] - মুসনাদে আহমদ :১৬২০৭
[৩৫৩] - মুসনাদে আহমদ :১৫৯৭২
[৩৫৪] - দ্রঃ তিরমি:৬১৬
[৩৫৫] - তিরমিযি : ৮৮৫
[৩৫৬] - তিরমিযি :২১৯
[৩৫৭] - সূরা আল বাকারাহ :১৯৫
[৩৫৮] - সূরা আররহমান :৬০

[৩৫৯] - সহীহ মুসলীম : ১০৫৩
[৩৬০] - বুখারী :১১২২
[৩৬১] - ইবনু কাইয়েম : মাদারিজুস্সালিকিন : ২/১৫৮
[৩৬২] - বুখারী :১৮৬১
[৩৬৩] - দ্রঃ বুখারী : ১৫৪৪, ১৭৫১
[৩৬৪] - মুসনাদে আহমদ :১৯৪৩৫
[৩৬৫] - ইবনে মাজাহ :৪০৩২
[৩৬৬] - বুখারী : ৬০২৪
[৩৬৭] - আল-ইমরান: ১৫৯
[৩৬৮] - সহীহ মুসলীম :১২৭৪
[৩৬৯] - দ্রঃ আবুদাউদ:১৯০৫
[৩৭০] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২১৮
[৩৭১] - বুখারী :১৬৬০
[৩৭২] - হাজ্জাতুল বিদা লি ইবনে হাযম: ১২৪
[৩৭৩] - বুখারী :১৬৫৬
[৩৭৪] - সহীহ মুসলীম : ১২১৮
[৩৭৫] - দ্রঃ বুখারী : ১৬৭৯
[৩৭৬] - মুসতাদরাক লিল হাকেম :১/৬৫০
[৩৭৭] - বুখারী : ১৬৭৯
[৩৭৮] - ইবনে হিব্বান :৪০১৫
[৩৭৯] - মুসনাদে আহমদ :১২০৮৭
[৩৮০] - মুসনাদে আহমদ :১৯০
[৩৮১] - দ্রঃ সহীহ বুখারী :৭২৩০
[৩৮২] - সীরাতুননাবী : ইবনে কাসির :৪/৩৩৩
[৩৮৩] - বুখারী :১৮২৫
[৩৮৪] - সহীহ মুসলীম :১১৯৬
[৩৮৫] - আবু দাউদ :১৯৫১
[৩৮৬] - আবুদাউদ:১৯৫৭
[৩৮৭] - বুখারী : ১৭৩৪
[৩৮৮] - বুখারী :১৬৩৬
[৩৮৯] - তিরমিযি : ১৯৫৪
[৩৯০] - তিরমিযি: ৮৮১
[৩৯১] - বুখারী :১৬৩৬
[৩৯২] - তিরমিযি : ৮৮৫

[৩৯৩] - বুখারী :১৭৭২
[৩৯৪] - দ্রঃ বুখারী : ১৭৭২
[৩৯৫] - বুখারী : ৩৫৬২
[৩৯৬] - বুখারী :৩৫৬০
[৩৯৭] - বুখারী :৭৩৬৭
[৩৯৮] - বুখারী :১৫১৩
[৩৯৯] - তিরমিযি :২১৯
[৪০০] - দ্রঃ সহীহ মুসলীম :১২৫৯
[৪০১] - দ্রঃ নাসায়ী :৩০২৪
[৪০২] - আবু দাউদ : ১৭৪২
[৪০৩] - মুসলীম : ১০৭২
[৪০৪] - সহীহ মুসলীম :২০৫
[৪০৫] - বুখারী :৩৮৮৪
[৪০৬] -মুসনাদে আহমদ : ২৬৫৯০
[৪০৭] - সহীহ মুসলীম : ১২১১
[৪০৮] - তিরমিযি :৮৯৩
[৪০৯] - বুখারী :৪৩৯৮
[৪১০] - তিরমিযি : ৩৮৯৫
[৪১১] - বুখারী :২৫৫৩
[৪১২] - শুআরা : ২১৪
[৪১৩] - বুখারী :১৭০৪
[৪১৪] - আল ইমরানঃ ৯৭
[৪১৫] - আবু দাউদ:১৭২২
[৪১৬] - বুখারী : ১৬৭৮
[৪১৭] - বুখারী : ৫০৮৯
[৪১৮] - ইবনে মাজাহ :২৯৩৭
[৪১৯] - ইবনে মাজাহ :২৮৮৩
[৪২০] - মুসনাদে আহমদ :২৮৬৮
[৪২১] - সহীহ মুসলীম :১৩৩৬
[৪২২] - সহীহ মুসলীম : ২৬৭৪
[৪২৩] - সহীহ মুসলীম :১৮৯৩
[৪২৪] - সহীহ মুসলীম :১৮৯৩
[৪২৫] - ইবনে মাজাহ :৩০৭৪
[৪২৬] - বুখারী :১৬৩৫

[৪২৭] - বুখারী : ১৬৩৫
[৪২৮] - বুখারী :১৬৩৭
[৪২৯] -বুখারী :১৭৫৪
[৪৩০] - তাহা :২৯-৩৪
[৪৩১] - সূরা হুদ :৮০
[৪৩২] - মুসনাদে আহমদ : ৫৬৪
[৪৩৩] - আবু দাউদ :১৮৩৩
[৪৩৪] - বুখারী :১৬১৯
[৪৩৫] - বুখারী :১৬২৬
[৪৩৬] -বুখারী : ১৬১৮
[৪৩৭] - আস্‌সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বি : ৫/৮৪
[৪৩৮] - মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ : ১২৯৫১
[৪৩৯] - সহীহ মুসলীম : ১৪২
[৪৪০] - বুখারী :৪৩৯৮
[৪৪১] - নাসায়ী :৩০৩৪
[৪৪২] - সূরা আসসিজদা :২৪
[৪৪৩] -সূরা আল ইমরান :১৪৬
[৪৪৪] - বুখারী :১৭৮৮
[৪৪৫] - সহীহ মুসলীম :১২১১
[৪৪৬] - সহীহ মুসলীম :১২১৩
[৪৪৭] - ইবনে মাজাহ : ২৯৩৬
[৪৪৮] - বুখারী : ১৫৬০
[৪৪৯] - মুসনাদে আহমদ :৩৫১৩
[৪৫০] -বুখারী :৫০৮৯
[৪৫১] - তিরিমিযি :৩৮৯৫
[৪৫২] - সূরা আশ-শুয়ারা :২১৪
[৪৫৩] - বুখারী :১৬৩৬